

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক তত্ত্ব ও বাস্তবতা

সম্পাদনা
সুরাইয়া বেগম

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক : তত্ত্ব ও বাস্তবতা
Class Relations in Bangladesh: Theory & Practice

সম্পাদনা: Edited by:
সুরাইয়া বেগম Suraiya Begum

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩ | Published in: December 2023

প্রকাশনায়: Published by:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) Research Initiatives, Bangladesh
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি House 07, Road 17, Block C,
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
ফোন : (+৮৮০-২) ২২২২৭৪০৫১ Phone: (+880-2) 222274051
ই-মেইল : rib@citech-bd.com; ওয়েবসাইট : www.rib-bangladesh.org
YouTube: Research Initiatives, Bangladesh RIB

সহায়তায়: Supported by:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং Rosa Luxemburg Stiftung
স্ট্রেসে দেব প্যারিসের কমিউন ৮এ StraÙe der Pariser Kommune 8A
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী 10243 Berlin, Germany

মুদ্রণে: Printed by:
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড Dana Printer Limited
গ-১৬, মহাখালী বা/এ, Ga-16, Mohakhali C/A
বনানী, ঢাকা-১২১৩ Banani, Dhaka-1213

প্রচ্ছদ: Cover:
নাভিদ আনজুম হাসান Navid Anjum Hassan

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. The publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication. The content of the publication is the sole responsibility of the author of the RIB and does not necessarily reflect the position of RLS.

সূচিপত্র

ভূমিকা	৪
কৃতজ্ঞতাস্বীকার	৫
প্রাককথন: এম এম আকাশ	৬
সূচনা বক্তব্য: সুরাইয়া বেগম	৯
১. বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক সমাজের প্রেক্ষিত মনিরুল ইসলাম খান	১২
২. বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: অর্থনৈতিক পরিসর ও বাস্তবতা এম এম আকাশ	৪০
৩. নারীবাদ: আন্দোলন ও শ্রেণি সম্পর্ক মেঘনা গুহঠাকুরতা	৬৭
৪. বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক ও শ্রমিকের প্রেক্ষিত আনু মুহাম্মদ	৮১
৫. বাংলাদেশে ক্ষেত মজুর আন্দোলন ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব শামসুজ্জামান সেলিম	১১১

ভূমিকা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব) তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, কৃষক সমাজ, শিক্ষা, উন্নয়ন, অধিকার এবং দারিদ্র্যের মানবিকীকরণ প্রমুখ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সেই সূত্রেই বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ও প্রসারণেও ভূমিকা রাখছে। কারণ জ্ঞানের উপর মালিকানা সমাজের প্রান্তিকতায় যারা অবস্থান করে তাদের মানসিক শক্তিকে দৃঢ় করতে সহযোগিতা করে। জ্ঞান এসব জনগোষ্ঠীকে বুঝাতে সহায়তা করে যে, সমাজে তাদের শ্রেণিগত অবস্থান কোথায়, সমাজের অন্যায়ের সাথে তাদের উৎপাদন সম্পর্ক বা অন্য কথায় শ্রেণি সম্পর্কের প্রকৃতি কি, কিভাবে উৎপাদন সম্পর্ক বিদ্যমান সমাজে কাজ করে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে যে উৎপাদন সম্পর্ক বিদ্যমান সেটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর বিভিন্ন সম্ভাবনার দিকগুলো কৃষকদের কাছে সেভাবে নেওয়া হয় না। এসব বিষয়কে তাত্ত্বিক পরিসরে এবং বাস্তবতায় অনুধাবনের জন্যে আরও সুস্পষ্টতা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই রিইব “বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: তত্ত্ব ও বাস্তবতা” বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী ওয়েবিনারের আয়োজন করেছিল। যেখানে বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ আলোচনা করেছেন।

রিইব জ্ঞানের অসমতা কমিয়ে আনার জন্যে এসব আলোচনাকে প্রকাশনার মাধ্যমে প্রসারিত করে থাকে। যাতে সাধারণ পাঠক জ্ঞানের বিষয় বৈচিত্র্যকে ধারণ করে নিজেদের মননকে উন্নত করতে পারে। আশা করি এই বই প্রকাশের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সফল হবে।

শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

মানব ইতিহাসের বিকাশের ধারা উৎপাদন শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন শক্তি ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করে। উৎপাদন সম্পর্কের এই পরিবর্তন এবং বিকাশকে বর্তমান বাংলাদেশের পরিসরে জানা বোঝার জন্যে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ “Transformation towards Ecological & Gender Justice and Sustainability (2023-2024)” শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে “বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক : তত্ত্ব ও বাস্তবতা” শিরোনামে একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে। পাঁচদিনব্যাপী ওয়েবিনারে ধারাবিবরণী হিসেবে এই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে।

বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপনা করেছেন ড. মনিরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক এম এম আকাশ, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ এবং জনাব শামসুজ্জামান সেলিম। তাঁদের অংশগ্রহণ আমাদের ওয়েবিনারকে ঋদ্ধ করেছে। এজন্য আমরা তাঁদেরকে এবং তাদের বক্তব্যের উপর যারা আলোচনা করেছেন তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

আলোচনার বক্তব্য ধারণ করতে, ওয়েবিনার আলোচনাকে শ্রুতি থেকে লিপিতে পরিণত করতে এবং অনুষ্ঠানকে যথোপযুক্ত করতে নাভিদ আনজুম হাসান, মো: ইফতেখার আলী, চৈতন্য কুমার দাস এবং মো: আনোয়ার হোসেনকে ধন্যবাদ। সর্বোপরি প্রতিদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এবং সক্রিয় আলোচনা করার মধ্য দিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি ও নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতাত এবং Mr. Vinod Koshti, Project Manager, Rosa Luxemburg Stiftung আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সুরাইয়া বেগম

পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব

প্রাককথন

এই গ্রন্থটি ‘রিইব’ আয়োজিত একটি ‘ওয়েবিনারের’ ধারাবিবরণী সংকলিত করে রচিত। এই ওয়েবিনারের বিষয়বস্তু ছিল- ‘বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক : তত্ত্ব ও বাস্তবতা’।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি সুপ্রচলিত আলোচনা ও বিতর্কের নাম হচ্ছে ‘Mode of Production Debate’। এই বিষয়টি শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতেও বহুল আলোচিত বিষয়। এই বিষয় নিয়ে দু-দেশের প্রখ্যাত পণ্ডিতদের নানা জটিল আলোচনা তখন হয়েছিল। পরে ড. মাহাবুব হোসেন তার কেন্দ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশকৃত থিসিসে সে আলোচনাটি পুনরায় পেশ করেন। এছাড়া ড. স্বপন আদনান, আবু আব্দুল্লাহ এবং সর্বশেষে প্রখ্যাত শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদ রিইবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. আনিসুর রহমানও এ নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতের EPW পত্রিকাতে এ নিয়ে উষা পাটনায়ক ও অন্যান্যরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর বাম রাজনৈতিক মহলে আখলাকুর রহমান সর্বপ্রথম কৃষিতে ধনবাদী উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে দাবী করে জাসদের পক্ষ থেকে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। অনেকেই তখন তা অস্বীকার করে ‘আধা সামন্তবাদের’ কথা বলতেন কারণ কৃষিতে তখনো ‘মজুর-মালিক’ সম্পর্ক প্রধান হয়ে উঠেনি এবং ‘বর্গা প্রথা’ বেশ জোরালো ভাবে উপস্থিত ছিল। এ ছাড়া অসংখ্য আত্মপোষণশীল ক্ষুদ্র ও মধ্য চাষীর প্রাবল্য ছিল। গ্রামে জোতদার, বর্গাচাষী, ধনীচাষী, মধ্যচাষী, গরীব চাষী ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর নিয়ে গ্রামীণ সমাজ গঠিত এইটাই ছিল বাস্তবতা এবং ধারণা। তবে ধনবাদ প্রধান কিনা তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। পরে বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদনশক্তির বিকাশ ঘটে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে। ভিত্তি হচ্ছে জলসেচ, উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও নিবিড় শ্রম। গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ফসল বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হতে শুরু করে। গ্রামে অকৃষি খাত, ব্যবসা, ফাঁড়িয়া, মধ্যস্বত্বভোগী ইত্যাদির উদ্ভব ও বিকাশ হতে থাকে। বর্গাস্বত্বের মধ্যে নানা পরিবর্তন আসে এবং চাষীদের মধ্যে পৃথকায়ন, নিঃস্বকরণ ও মেরুকরণ হতে থাকে। গ্রামে গ্রামীণ মজুররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হন। চিরায়ত কৃষকরা সংখ্যায় কমতে থাকেন।

পুঁজি বিনিয়োগকারী কৃষক, পণ্য বিক্রেতা কৃষক, মজুর নিয়োগকারী কৃষক, ব্যবসায়ী কৃষক, অনুপস্থিত ভূমি মালিক, চুক্তি ভিত্তিক চাষী ইত্যাদি নানা ধরনের পেশা ও শ্রমবিভাজন গ্রামে এখন ছড়িয়ে পড়েছে। সব কিছু এখন জটিল এবং বহুমুখী। তবে এদের আনুপাতিক গুরুত্ব কার কতটুকু তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া মুশকিল। এখন কি একে ধনতান্ত্রিক কৃষি বলা যাবে? নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে এই বহুগাঠনিক formation এর মধ্যে মুখ্য প্রবণতা কি? গ্রামের বাইরের শক্তি, রাষ্ট্র, কৃষি খাতে বিনিয়োগকারী এগ্রো বিজনেস, মধ্যস্থত্বভোগী নানা বাণিজ্যিক শক্তি, গ্রামের মধ্যে গড়ে উঠা অকৃষি (অর্থাৎ ফসল বহির্ভূত খাত) খাত, এগুলি কি পুঁজির রূপ ধারণ করে বাজার ও মজুরী সম্পর্কে গ্রামে ইতোমধ্যেই প্রধান ও নেতৃত্বদানকারী গঠনে পরিণত করে নি? তাহলে গ্রামে বিদ্যমান শ্রেণিসম্পর্কও তো বদলে গেছে। তার ফলে প্রধান দ্বন্দ্বও তো বদলে যাবে এবং শত্রু-মিত্র, সংগ্রামের সংগঠন, সংগ্রামের শ্লোগান, সংগ্রামের কৌশলগত দিকও তো বদলে যাওয়ার কথা। প্রকৃতপক্ষে আমার মতে এই উদীয়মান বিতর্কের পটভূমিতেই বর্তমান ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেই উদ্দেশ্যেই এই ওয়েবিনারটি আয়োজন হোক না কেন, এই ওয়েবিনারের সকল আলোচনা ঘুরে ফিরে উল্লিখিত এসব বিষয়কে নিয়েই করা হয়েছে। মূল আলোচনা উত্থাপন করেছেন পাঁচজন বক্তা। প্রথমদিন অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম আলোচনা উত্থাপন করেন ‘বাংলাদেশে শ্রেণিসম্পর্ক : কৃষক সমাজের প্রেক্ষিত’ বিষয়ে। দ্বিতীয় দিন মূল আলোচনা উত্থাপন করেন অধ্যাপক এম. এম. আকাশ সমগ্র ‘বাংলাদেশে শ্রেণিসম্পর্ক : অর্থনৈতিক পরিসর ও বাস্তবতা’ বিষয়ে। তৃতীয় দিনের আলোচক ছিলেন অধ্যাপিকা মেঘনা গুহঠাকুরতা। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল— ‘নারীবাদ : আন্দোলন ও শ্রেণিসম্পর্ক’। চতুর্থ দিনের মূল আলোচক ছিলেন অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ। তিনি আলোচনা করেছেন, ‘বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক : কৃষক ও শ্রমিকের প্রেক্ষিত’। সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি উত্থাপন করেন একজন মাঠের নেতা, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সাবেক সভাপতি কমরেড শামসুজ্জামান সেলিম। দুর্ভাগ্যবশত: ইতোমধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁর আলোচনার মুদ্রিত রূপটি আর দেখতে পাবেন না। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। তিনি মূলত: গ্রামীণ মেহনতিদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রতিবন্ধকতা ও সংগ্রামের বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন।

এসব আলোচনার পর প্রত্যেকটি ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী ‘রিইবের’ আমন্ত্রিত গবেষক, মাঠকর্মী, সংগঠক, আন্দোলনকারী, আন্তর্জাতিক অতিথিবৃন্দ, দেশীয় অতিথিবৃন্দ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মূল আলোচকরা এসব প্রশ্নের উত্তরও দিতে প্রয়াস পান। সেগুলির ধারাবিবরণীও এই বইয়ে সংযুক্তি করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থের শেষে ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা আলাদাভাবে সংযোজন করে দেওয়া হবে বলে আশা করছি। এই গ্রন্থটি তাই একাধারে একটি পূর্ণাঙ্গ Proceeding গ্রন্থ।

সব মিলিয়ে আমি শুধু এটুকুই বলবো যে এই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি সমসাময়িক গ্রামীণ সমাজকর্মীদের জন্য ‘সমাজ ও সমাজ পরিবর্তন’ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ‘রেফারেন্স’ বা ‘হ্যান্ডবুক’ হিসাবে থেকে যাবে। ইতিহাস অনুধাবন ও ইতিহাস সৃষ্টির কাজে লাগবে। ‘রিইব’-এর দার্শনিক প্রাণপুরুষ অধ্যাপক আনিসুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ‘বাংলাদেশের জনগণকে ইতিহাসের উপাদান (Object) না হয়ে ইতিহাসের স্রষ্টা (Subject) হতে হবে। সে জন্য তিনি ‘অংশগ্রহণমূলক সংলাপ’ ও ‘অংশগ্রহণমূলক গবেষণার’ উপর মূল গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেই দর্শনকে সামনে রেখেই এই ওয়েবিনারের আলোচনাগুলি অগ্রসর হয়েছে। তাই এই গ্রন্থের আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণ যদি নতুন ইতিহাস রচনায় এগিয়ে আসেন তাহলেই এই গ্রন্থপ্রকাশ সার্থক হবে। আর আলোচনার ধারাবিবরণী, রেকর্ড বা Proceedings হিসাবে যে মূল্য তা তো থাকবেই।

এম.এম. আকাশ

১৫/১২/২০২৩

প্রথম দিন : ২০ আগস্ট ২০২৩



সুরাইয়া বেগম

সঞ্চালক

পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব

সূচনা বক্তব্য

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) “বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: তত্ত্ব ও বাস্তবতা” শীর্ষক পাঁচদিন ব্যাপী ওয়েবিনারভিত্তিক এই আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। বিষয় হিসেবে এবং বর্তমান সময়ের পরিসরে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সঞ্চালনার প্রেক্ষিতে এখানে উল্লেখ্য যে, রিইব রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং এর সহায়তায় Transformation towards ecological and gender justice and sustainability শীর্ষক একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। মার্ক্সভিত্তিক গবেষণায় কৃষক সমাজের সাথে, কৃষক সমাজকে সাথে নিয়ে, মূলত কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ে সচেতনায়তন এবং একশন রিসার্চ করা এই প্রকল্পের অংশ। রিইব মূলত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানচর্চায় কাজ করে থাকে। সেই সূত্রে ২০-২৪ আগস্ট ২০২৩ প্রতিদিন বিকাল ৩টা- ৫টা পর্যন্ত সময়সীমায় এই ওয়েবিনার সিরিজ চলবে। এখানে শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়ে সমাজের বিশিষ্ট

ব্যক্তিগণ তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুবিধার্থে পূর্বেই ধারণ করা হয়েছে, তবে তাঁদের বক্তব্যের উপর আলোচনা এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে হবে।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বে শ্রেণি শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থনৈতিক পরিসরে। জীবন ধারণের জন্য যে সম্পদ আবশ্যকীয় তার মালিকানা থাকা এবং মালিকানা না থাকার ভিত্তিতে সমাজের মানুষকে বিভাজন করা এর মূল দিক। মার্ক্সবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী আদিম মনুষ্য সমাজে সামাজিক সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিলনা, তাই ধরে নেওয়া যায় তা শ্রেণিহীন সমাজ ছিল।

সমাজ বিবর্তনের ধারায় এবং প্রযুক্তির বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটায় এবং উৎপাদনের প্রেক্ষিতে উৎপাদক এবং মালিক শ্রেণির বিকাশ ঘটে। সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে এক শ্রেণি অপর শ্রেণির মধ্যকার যে সম্পর্ক তাকেই মোটা দাগে শ্রেণি সম্পর্ক নামে অভিহিত করা হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো, উৎপাদন সম্পর্ক তথা শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়ে তাত্ত্বিক দিক এবং বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা এই ওয়েবিনারের মূল বিষয়। মার্ক্সীয় দর্শনে শ্রেণির ধারণা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিতে কেন্দ্রীভূত আছে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ। মার্ক্সের মতে সমাজে শ্রেণি সৃষ্টি হয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে। নির্দিষ্ট একটি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে ব্যক্তির শ্রেণি নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ শ্রেণি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতেই শ্রেণির সৃষ্টি হয় এবং এই সম্পর্ক পরিবর্তনশীল। শ্রেণি সম্পর্ককে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে।

পাঁচদিনব্যাপী এই ওয়েবিনারে যারা আলোচনা করেছেন তাদের বিস্তারিত এখানে তুলে ধরা হলো।

২০ আগস্ট ২০২৩: বিষয়- বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক সমাজের প্রেক্ষিত, আলোচক: মনিরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২১ আগস্ট ২০২৩ : বিষয়- বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: অর্থনৈতিক পরিসর ও বাস্তবতা, আলোচক: এম এম আকাশ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২২ আগস্ট ২০২৩ : বিষয়: নারীবাদ: আন্দোলন ও শ্রেণি সম্পর্ক, আলোচক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ

২৩ আগস্ট ২০২৩ : বিষয় : বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক ও শ্রমিকের প্রেক্ষিত, আলোচক: আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৪ আগস্ট ২০২৩ : বিষয়: বাংলাদেশে ক্ষেত মজুর আন্দোলন ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব, আলোচক শামসুজ্জামান সেলিম, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি

আমরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে জানাচ্ছি যে, গত ১৭ আগস্ট বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সাবেক সভাপতি জনাব শামসুজ্জামান সেলিম ইন্তেকাল করেছেন। এজন্য নির্দিষ্ট দিনে শুধু তাঁর ধারণকৃত ভিডিও লেকচার প্রচারিত হবে, কিন্তু কোন মুক্ত আলোচনা হবে না। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান গুরু করছি।

অনুষ্ঠান আয়োজনের সুবিধার্থে এখন বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক সমাজের প্রেক্ষিত বিষয়ে অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খানের ধারণকৃত বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। তবে তিনি আজকের ওয়েবিনারে উপস্থিত আছেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।



ড. মনিরুল ইসলাম খান

অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক সমাজের প্রেক্ষিত

আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো। এই বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমি আমাদের কৃষি কাঠামো যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে বা বিকাশ লাভ করেছে সেই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করে নেব। এতে শ্রেণির উপর ভিত্তি করে আমাদের সমাজকাঠামো বোঝা যাবে। আমরা সমাজে একসাথে থাকি এবং সমাজে বিভিন্নরকম সম্পর্ক তৈরি হয়। সুতরাং এখানে দুটো বড় দিক- এক, আমরা সমাজবদ্ধ হচ্ছি এবং সমাজবদ্ধ হওয়ার মানেই হচ্ছে আমাদের সাথে পরস্পরের সম্পর্ক নির্মিত হচ্ছে। পরস্পরের সাথে যে সম্পর্কটি নির্মিত হচ্ছে, সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিভাবে এটি হচ্ছে? আমরা খুব সরলভাবে এটা বুঝতে চাই। আপনারা জানেন যে পরিবার একটি বড় প্রেক্ষিত। আমরা পরিবারের মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ হচ্ছি, পরিবার থেকে আমাদের পাড়া বা গ্রাম হচ্ছে।

আর আস্তে আস্তে এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্র পাচ্ছি। এখন এই যে আমরা একসাথে হলাম, গোষ্ঠীবদ্ধ হলাম, এখানে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা তৈরি হচ্ছে, এই পারস্পরিক সম্পর্কটা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে, আমাদেরকে শ্রেণি কিংবা অন্যান্য যেসব প্রত্যয়গুলো আছে, সে প্রত্যয়গুলোর উপরে কিছুটা নির্ভর করতে হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এই একসাথে থাকার জন্য আমরা নানা কাজকর্ম করছি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন কার্যক্রম করছি। এগুলোর মধ্য দিয়েই আমরা প্রতিষ্ঠান তৈরি করি এবং এই প্রতিষ্ঠান তৈরির মধ্য দিয়েই আমরা সংগঠন তৈরি করি এবং সেই সংগঠনগুলোকে আমরা জোড়া দেই এবং তার মধ্য দিয়েই একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজ সৃষ্টি হয়। এখন এইটাকে দেখার দুটো দৃষ্টিভঙ্গি আছে, একটা হচ্ছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, আরেকটা হচ্ছে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি মূলত শ্রেণি প্রত্যয়টাকে খুব জোরালোভাবে ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে যেটাকে আমরা বলছি ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে সমাজকে বিশ্লেষণের একটা ভিন্ন মাপকাঠি তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে বলা হয়েছে যে আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের আন্তঃনির্ভরশীলতা আছে, সেটা হতে পারে প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানের আন্তঃনির্ভরশীলতা। যেমন ধরুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্ভরশীলতা, কিংবা শ্রমিকের সাথে মালিকের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। সুতরাং একটা হচ্ছে নির্ভরশীলতার উপরে ঝোক দিচ্ছে বেশি, অপরদিকে মার্কসীয় কাঠামোতে দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি শ্রেণির উপরে কারণ সমাজ বিশ্লেষণে দুটোই চলে। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতা আছে এবং এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দেখা যায় কখনো মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি সমাদৃত হচ্ছে, আবার কখনো কখনো দেখা যায়, মার্কসীয় বিশ্লেষণে নতুন কোনো সীমাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে। আর ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে অনেকটা জৈবিক দেহের সাথে তুলনা করা হয়। জৈবিক দেহে যেমন আমরা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্তঃনির্ভরশীলতা দেখি, সেভাবেই মানুষে মানুষে পেশাগত আন্তঃনির্ভরশীলতা তৈরি হয়। এভাবেই এটাকে তারা জৈবিক সংহতি বলে অভিহিত করেন। জৈবিক সংহতিতে দ্বন্দ্ব

থাকতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বটা মুখ্য নয়, বরং এখানে মানুষের আন্তঃনির্ভরশীলতা মুখ্য। মার্কসীয় শ্রেণিকাঠামোকে বিশ্লেষণ করতে হলে কতগুলো বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে এই মার্কসীয় সংজ্ঞাটা কেন এত জনপ্রিয়তা লাভ করলো? এটা জনপ্রিয়তা লাভ করার পেছনে একটা বড় কারণ হলো যে, মার্কস তার সমাজ বিশ্লেষণে বলতে চাইলেন, আমাদের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হয়, তা তৈরি হয় কিছু বস্তুনিষ্ঠ উপাদানের ভিত্তিতে। সেই বস্তুনিষ্ঠ উপাদানগুলো আমাদের সম্পর্কগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যে আমরা ইচ্ছা করলেই সেই সম্পর্কটাকে উড়িয়ে দিতে পারব না। কিংবা আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের মতো করে সম্পর্কটাকে সাজিয়ে নিতে পারব না। তাহলে এটাকে আমরা বলছি বস্তুনিষ্ঠতা বা অবজেক্টিভ ফাউন্ডেশন। সুতরাং বিভিন্ন রকমের দার্শনিক ধারণা দিয়ে মার্কসের দর্শনটা তৈরি হয়েছে। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) এই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৮ সালে বিখ্যাত বই *এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্যা ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকোনমি* বইটি লেখেন। সুতরাং *দ্য ক্যাপিটাল* বা *পুঁজি* (১৮৬৭ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থটাকে যদি আমরা তাঁর চূড়ান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ মনে করি, সেটাকে কিন্তু তিনি ধারাবাহিকভাবে নিয়ে এসেছেন; হঠাৎ করে কিন্তু আনেননি। কারণ তার একটা সংশ্লিষ্টতা ছিল জার্মান ভাববাদী দর্শনের সাথে। তিনি যে বিতর্কটার সূত্রপাত করলেন সেটা গাছের মত বড় হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলো। যেটাকে আমরা বলছি *পুঁজি* গ্রন্থ (১৮৬৭-১৮৯৪)।

১৮৫৯ সালে প্রকাশিত *এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্যা ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকোনমি* বইতে কার্ল মার্কস বলেছেন, মানুষকে সামাজিকভাবে বেঁচে থাকতে হয়। এই সামাজিকভাবে বেঁচে থাকা বলতে তিনি কি বোঝালেন? এর মানে তিনি বোঝালেন, আমরা আরেকজনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে বেঁচে থাকি। যেমন আমরা যদি একদম জৈবিকভাবে চিন্তা করে দেখি, তাহলে কিন্তু আমরা একেবারে জৈবিকভাবেই নির্মিত হচ্ছি। তিনি দেখাচ্ছেন, আমাদের যে জৈবিক অস্তিত্ব, আমরা যে বেঁচে থাকি, সেজন্য আমাদের খাদ্য দরকার হয়, এছাড়া আমাদের অন্যান্য প্রয়োজন আছে, কারণ বেঁচে থাকা মানেই আমাদের প্রয়োজন মেটাতে হবে। বেঁচে থাকা এবং প্রয়োজন মেটানো, এই দুটো কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমি যদি প্রয়োজনগুলোকে না মেটাই, তাহলে কিন্তু আমি বেঁচে থাকছি না। তাহলে বেঁচে থাকা এবং

প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করার যেই সমন্বয় বা ইন্টিগ্রেশন, তারই ফলাফল হিসেবে তিনি দেখাচ্ছেন যে, আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো তৈরি হচ্ছে। সুতরাং এইটাকে তিনি এক ধরনের ভূমিকা বা ইন্ট্রাষ্টরি রিমার্কস হিসাবে দিচ্ছেন। এর আগে তিনি জার্মান মতাদর্শ দিয়ে বস্তুবাদী একটা প্রেক্ষিত নির্মাণ করেছিলেন, যে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের খুব সহজ পার্থক্যটা হচ্ছে, আমরা কী সমাজের বিদ্যমান পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বা বিদ্যমান অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? নাকি আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদেরকে পরিচালিত করি? এটাই হচ্ছে এই দুটি ভাবনার মধ্যে একটা বড় ধরনের বিতর্ক, যে মানুষ তার চিন্তা দিয়ে কি তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে, না মানুষ তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে? মানুষ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যখন তার সমস্যার সমাধান করবে, তখন তাকে এই বিরাজমান অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, শুধু খাপ খাইয়ে নিতে হবে না, সে যদি মনে করে এটা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেখান থেকেও তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। সুতরাং এইটা হচ্ছে বস্তুবাদী বিশ্লেষণ।

বস্তুবাদী বিশ্লেষণে তিনি বললেন যে, আমাদের উৎপাদন কর্মকাণ্ড হচ্ছে এই বস্তুবাদী প্রেক্ষিতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তার মানে বেঁচে থাকা আমাদের প্রধান কাজ, আর বেঁচে থাকার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক উৎপাদনে যেতে হচ্ছে, সেই অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য আমরা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করছি। সুতরাং এই অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য আমাদের যেসব উপাদান দরকার, সেগুলো কার হাতে আছে এবং এগুলো কে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে, তার উপর নির্ভর করছে একজনের শ্রেণিগত অবস্থান। এভাবে শ্রেণিকে একটা বস্তুগত প্রেক্ষিত তিনি দিলেন। এটা আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আমাদের অর্থনৈতিক, আদর্শগত ও রাজনৈতিক পরিসরে— এই তিনটা স্তরের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমাজকাঠামোর সংজ্ঞা প্রণয়ন করলেন এবং সেখানে অর্থনীতিকে প্রধান নির্ধারকের স্তরে বসালেন। এখানে তিনি বললেন, সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ঐতিহাসিকভাবেই পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটা সমাজের আগের পর্যায় নির্ধারণ করছে তার পরের পর্যায়ের স্বরূপ কী হবে। যেমন এখন আমরা যেভাবে জীবন অতিবাহিত করছি, তার উপর নির্ভর করছে আগামী দশ বছর পর বাংলাদেশ কিভাবে চলবে। এভাবে তিনি একটা ঐতিহাসিক রূপরেখা তৈরি করলেন এবং সাম্যবাদী সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ

ইত্যাদি নামকরণ করলেন। আমরা যখনই শ্রেণিকাঠামোকে বুঝতে যাব, আমাদেরকে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি— এই তিনটি স্তরকে বুঝতে হবে, এই তিনটি স্তরের অন্তর্নিহিত সম্পর্কটা কি, কে কাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে, কোন স্তরটা কখন সক্রিয় হবে, কোন স্তর কার উপর কতটা নির্ভরশীল, সমাজ বিকাশে কে কতটা অবদান রাখবে, যাবতীয় কিছু হচ্ছে বস্তুবাদী বিশ্লেষণ। এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজ বিবর্তিত হচ্ছে ও নতুন অবস্থা তৈরি হচ্ছে।

এই কথাগুলোকে মনে রেখে যদি আমরা বাংলাদেশের কৃষিকাঠামোর দিকে তাকাই, সেক্ষেত্রে ইতিহাসের কতটুকু পিছনে আমরা যাব সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিস্তৃত আলোচনা আমরা করতে পারব না। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কিছু পর্যায় আছে, আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। সবচেয়ে প্রথমে যদি আমি বলি, বাংলাদেশের একটি প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্যায় আছে, ঔপনিবেশিক পর্যায় আছে এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায় আছে। এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যদি আমরা বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করতে চাই। মার্কসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের প্রধান বিষয়টা ছিল যে, ভারতের উৎপাদনব্যবস্থা তিনি এশিয়াটিক উৎপাদনব্যবস্থা বলেছেন, যেখানে তিনি কোন শ্রেণির অস্তিত্ব দেখছেন না, কারণ রাষ্ট্র এত শক্তিশালী ছিল। অর্থাৎ, শ্রেণিকাঠামোহীন একটা সমাজ, যে সমাজে রাষ্ট্র সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই ধরনের একটা সমাজে প্রথম একটা শ্রেণির অস্তিত্ব তৈরি হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে। বিখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মাধ্যমে প্রথম শ্রেণিকাঠামো তৈরি করা হলো। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম কৃষিক্ষেত্রে একটি শ্রেণিকাঠামোর উদ্ভব হলো, যাদেরকে আমরা বলছি জমিদার, যারা জমির মালিক হিসেবে আবির্ভূত হলো। সেই জমিকে তারা বিক্রি করতে পারতো, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে পারতো।

এই যে নতুন একটা জমিদার শ্রেণি তৈরি হলো, যাদের জমি কৃষকরা চাষ করবে। এই জমিদার আর রায়ত। এই নিয়ে প্রাথমিক পর্বটা ১৭৯৩ সালের পরে তৈরি হলো এবং জমিদারি ব্যবস্থার কতগুলো ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নতুন একটা শ্রেণি বিকাশ লাভ করলো, যেটা হচ্ছে মধ্যসত্ত্বভোগী। আর এর মাধ্যমে তালুকদারী ব্যবস্থা তৈরি হলো। আজকের বাংলাদেশকে

বুঝতে হলেও এই তালুকদারী ব্যবস্থাটাকে বুঝতে হবে। জমিদার, মাঝখানের মধ্যসত্ত্বভোগী যাদেরকে বলা হচ্ছে তাদেরকে তালুকদার এবং রায়ত— এই যদি প্রধান তিনটি শ্রেণি হয়, এই প্রধান তিনটি শ্রেণির মধ্যে একটা যে দ্বন্দ্ব তৈরি হলো সেটা একটা সংঘাতময় অবস্থা তৈরি করে। সেই কারণেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে একাধিক ভূমি সংস্কার এসেছে। কারণ রায়তরা চেয়েছে বেঁচে থাকতে আর জমিদার এবং মধ্যসত্ত্বভোগীরা চেয়েছে তাদের উদ্ধৃতটাকে বৃদ্ধি করতে। একদিকে উদ্ধৃত নেওয়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ, আর অন্যদিকে রায়ত বা কৃষকের বেঁচে থাকা। কৃষকের বেঁচে থাকা এবং জমিদারের আহরণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বটাই কিন্তু উপনিবেশিক আমলে উপমহাদেশের কৃষিকাঠামোর গতিশীলতা তৈরি করে দিয়েছে।

এরপর পাকিস্তানী আমলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। সেসময় পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের জমিদারদের বড় অংশই ছিল অমুসলমান বা হিন্দু এবং তারা প্রচুর পরিমাণে ওপারে চলে গেল। দেখার বিষয় এই জমিগুলো কার কাছে গেল? এছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রায়তদের মধ্যেও বিভাজন তৈরি হচ্ছে, সেখানে বিভবান রায়ত তৈরি হচ্ছে এবং সেখানেও বিভবান রায়তদের মধ্যে একটা জোতদার শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। সুতরাং ১৯৫০ সালে যে ভূমি সংস্কার করা হলো, সেখানে দেখা গেলো এই জোতদার এবং উচ্চ পর্যায়ের বিভবান রায়তরা হিন্দুদের ফেলে যাওয়া জমির একটা বড় মালিকানা পেয়ে গেলো। পাকিস্তান আমলে জোতদারী একটা পরিপক্বতা লাভ করেছিল। এছাড়া একদিকে আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ছিল, আরেকদিকে ভূমিহীন মজুর তৈরি হচ্ছিল। ১৮৮০ সালের দিকে অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন কৃষিশুমারি এবং জরিপ অনুযায়ী ভূমিহীন কৃষি মজুরদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালে যে কৃষি কাঠামোটা তৈরি হলো পাকিস্তানে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা শক্তিশালী জোতদার শ্রেণি তৈরি হলো। এই জোতদার শ্রেণির মধ্যে কেউ কেউ মধ্যসত্ত্বভোগী থেকে উঠে এসেছে, আবার কেউ কেউ উচ্চবিত্ত রায়তদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। পাশাপাশি এটা যদি উত্তরবঙ্গের চিত্র হয়, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে কুমিল্লা, নোয়াখালী অঞ্চলে দেখতে পাচ্ছি অনেক ছোট ছোট জোতের মালিক এবং সেখানে গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যাধিক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। আবার পশ্চিমাঞ্চলেও দেখতে পাচ্ছি জমির মেরুৎকরণ হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিকাঠামোর মেরুৎকরণ

দেখতে পাচ্ছি, অন্যদিকে গৃহস্থ কৃষি বা পিজ্যান্ট ফার্মস-এর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে।

কৃষক সমাজের বিশ্লেষণে দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্মাণ করেছিল রাশিয়ার আলেক্সান্ডার চায়ানভ (১৮৮৮-১৯৩৭)। তিনি যে প্রাথমিক কাঠামোটা তৈরি করেছিলেন, সেখানে কৃষক অর্থনীতি খুবই শক্তিশালী একটা দৃষ্টিভঙ্গি। আর অন্যদিকে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে কেমন করে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণির মেরুৎকরণ হচ্ছে। মেরুৎকরণ হওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশক্তি জমি একটা শ্রেণির হাতে যখন চলে আসছে, তারা কেমন করে বাজারমুখী হচ্ছে এবং সেখান থেকে তারা উদ্ধৃত শোষণের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে এবং পুঁজিবাদী কৃষিকাঠামো নির্মাণের দিকে তাদের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে এবং কৃষিকে ঘিরে ভূমিহীন সর্বহারা শ্রেণি তৈরি হচ্ছে।

ইংল্যান্ডকে কেন্দ্র করে যে ধ্রুপদী কৃষিকাঠামো যেটা মার্কসের পুঁজি গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি, সেরকমটা আমরা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে বা বাংলাদেশেও দেখতে পাচ্ছি না। এক্ষেত্রে আমাদেরকে মার্কসীয় চিন্তাভাবনা কিছুটা মাথায় রাখতে হবে, কিছুটা চায়ানভীয় চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। যাইহোক বাংলাদেশে ১৯৫০-১৯৭০ পর্যন্ত একটা শ্রেণি তৈরি হয় যাদের হাতে প্রচুর পরিমাণে জমি। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাদার এবং ভূমিহীন শ্রেণিও তৈরি হল। এভাবে একটা নতুন কৃষিকাঠামো তৈরি হলো, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, যাদের হাতে জমি আছে তারা বর্গাপ্রথা, আড়তদারি, ফড়িয়াগিরি এবং মহাজনীর দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা পূর্ব পাকিস্তানে ধ্রুপদী পুঁজিবাদী কৃষিকাঠামো পেলাম না। পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে একটা বাঙালি নতুন বুর্জোয়া শ্রেণি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা তাদেরকে উঠতে দিচ্ছিল না। আরেক দিকে মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক বঞ্চনা তৈরি হচ্ছিল। এই সকল কিছু মিলিয়েই বাংলাদেশ আন্দোলন তৈরি হলো। সুতরাং বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রেক্ষিতটাই হচ্ছে একদিকে উঠতি বুর্জোয়াদের অসন্তুষ্টি, অন্যদিকে মধ্যবিত্তের এক ধরনের অসন্তুষ্টি। তাদের সাংস্কৃতিক বঞ্চনা থেকে এবং গ্রামের জোতদারদের যে আকাজক্ষা, এইসব নিয়েই বাংলাদেশ আন্দোলন তৈরি হয়েছে এবং বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের প্রভূত প্রভাব

ছিল। আমাদের সংবিধানেরও একটা মূলনীতি সমাজতন্ত্র। কিন্তু আমরা কি সমাজতান্ত্রিক দেশ হতে পারলাম? সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কৃষিক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন। এটা নিয়ে চায়ানভ যেমন কাজ করেছেন, এটা নিয়ে লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) নিজস্ব বক্তব্য আছে এবং মার্কসেরও নিজের বক্তব্য আছে। কারণ মার্কস, এঙ্গেলস প্রত্যেকেই জানতেন জমির প্রতি কৃষকের সাংঘাতিক মায়া এবং তারা কখনও জমিকে রপ্তায় হতে দেবে না। এটাকে মাথায় রেখে মার্কস কৃষককে কখনোই শিল্পায়িত বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গী হিসাবে স্বীকৃতি দেননি। এজন্য তিনি বললেন, তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা দুর্বল এবং তারা কখনোই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হবে না। সুতরাং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলাদেশীরা চেষ্টা করেছে খুব বেশি পরিমাণ জমি যেন পুঞ্জিভবণ না হয়। তারা ভূমি সংস্কার করতে চেয়েছে, কিন্তু ভূমি সংস্কার করতে চাওয়ার ফলে আমরা যে খুব বেশি জমি উদ্ধার করতে পেরেছি তা নয়। ১৯৭২ এর পরের দিকে যদি আমরা তাকাই, সে সময়কার জোতদারী কাঠামোকে কেউ কেউ বলছেন আধা-সামন্তান্ত্রিক কাঠামো। সেসময় একদিকে উত্তরবঙ্গের জোতদারী কাঠামো, আরেকদিকে পূর্ববঙ্গের যেমন কুমিল্লা, নোয়াখালীর ছোট ছোট গৃহস্থ পরিবারের সমন্বয়েই বাংলাদেশের কৃষিকাঠামো। একদিকে জোতদারী আধিপত্য, আরেকদিকে পরিবারভিত্তিক খামার- এই দুইটা নিয়ে আমরা কতটা ধনতন্ত্র বিকাশের সুযোগ তৈরি করতে পেরেছিলাম? এ সময় সবুজ বিপ্লব এসেছে এবং ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে তা একটা গতিশীলতা তৈরি করলো। আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়লো, কিন্তু সেই উৎপাদনশীলতা দিয়েও আমরা ধ্রুপদী পুঁজিবাদের দিকে যেতে পারলাম না। আমি আপনাদেরকে ১৯৯০ সালের একটা গবেষণার কথা বলি, যেটা পারসিস্টেন্স এন্ড পোলারাইজেশন-এ স্পষ্ট বলা হলো, কৃষক সমাজ জমিকে ধরে রাখছে, তারা জমি ছেড়ে দিচ্ছে না। কৃষিকাঠামোর ক্ষেত্রে কৃষকের জমির প্রতি মায়া একটা বড় উপাদান। সুতরাং বাংলাদেশে ধ্রুপদী শ্রেণিবিভাজন ঘটেনি। আমরা লক্ষ্য করছি যে, এখানে জোতদার কিংবা ধনী কৃষক তৈরি হয়েছে। এখন সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে যারা জোতদার থেকে ধনী কৃষক তৈরি হয়েছে, তারা কিন্তু ধনীক শ্রেণি হিসেবে তৈরি হতে পারেনি, কারণ শিল্পায়িত পুঁজিবাদ খুব মন্থর গতিতে চলেছে। এই দুইয়ের মধ্যে একটা মেলবন্ধন দরকার ছিল। যদি শিল্পায়ন হত, এখানে কৃষিপণ্যের

দাম বেড়ে যেত, আমাদের শিল্পায়নের কাঁচামাল দরকার হত। এতে কৃষিপণ্যের দামটা বৃদ্ধি পেত এবং পণ্যায়ন বা কমোডিফিকেশন আরও দ্রুত হত। এখানকার স্লথ গতির শিল্প পুঁজির বিকাশ গ্রামীণ পুঁজিবাদের বিকাশকে কখনোই গতিশীলতা আনতে দেয়নি। অন্যদিকে ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্গাদাররা থেকে গেছে। তাদের দরকার পুঁজি, তাদের দরকার বেঁচে থাকার টাকা। সুতরাং মহাজনী প্রথার প্রাধান্য এখানে সবসময় ছিল। এর মধ্য থেকে সবুজ বিপ্লব এসেছে, অর্থাৎ অত্যন্ত জটিল একটা প্রক্রিয়া। একদিকে উত্তরাধিকার হিসাবে জোতদারী দেখতে পাচ্ছি, আবার একদিকে গৃহস্থ কৃষিখামারি দেখতে পাচ্ছি, আবার ভূমিহীন কৃষি মজুর দেখতে পাচ্ছি।

সুতরাং এর মধ্য থেকে পুঁজিবাদ কতটুকু বিকশিত হতে পারছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। এর মধ্যে কৃষিকাঠামোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উপাদান হচ্ছে জনসংখ্যার স্বীকৃতি, এইটা চায়ানভীয়ান মডেলের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি। অর্থাৎ যখনই কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে তখনই জোতের আয়তন অর্থাৎ ফার্ম সাইজ ছোট হয়ে আসছে। ছোট ফার্মের মধ্যে পণ্যায়ন বা কমোডিফিকেশন করার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। অন্যদিকে এখানে প্রচুর বর্গাদার বা প্রান্তিক কৃষক আছে, তাই তারা বর্গা নেওয়া বা লিজের দিকে ঝুঁকছে। যাদের কাছে জমি আছে তারা জমি থেকে উদ্ধৃত আহরণের জন্য নিজে কৃষিকাজ করার চাইতে জমি ভাড়া দেওয়াটাকে লাভজনক এবং নিরাপদ মনে করছে। কারণ সে আগাম টাকা নিয়ে জমি লিজ দিয়ে দিলে তার একটা নিরাপদ ও নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা থাকে। আর যিনি বর্গা বা লিজ নিচ্ছেন, তার দায় হচ্ছে কেমন করে কৃষিকাজের মাধ্যমে জমি থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে আসবে। এই প্রক্রিয়ায় কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকশিত হওয়া বেশ কঠিন।

আমি কৃষিতে পুঁজিবাদের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ পুঁজিবাদী কাঠামো দিয়ে গ্রামবাংলার কৃষি কাঠামোটিকে বুঝতে চাইলে আমাদের কাছে শ্রেণিটাকে নির্দেশ করা বা চিহ্নিত করা সহজ হবে। একদিকে একটা উদ্ধৃতশ্রেণী, আরেকদিকে একটা কৃষি মজুর শ্রেণি- এই ধরনের মেরুকরণকৃত কাঠামো কি আমরা পাচ্ছি? আমরা সেটা আজও পর্যন্ত পাচ্ছি না। যাদের হাতে জমি আছে কৃষির প্রতি তাদের এক ধরনের অনীহা তৈরি হচ্ছে, তারা তাদের জমিটা লিজ দিয়ে দিতে চাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিআইডিএস-এর আরেকটা জরিপের উদ্ধৃতি দিচ্ছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে

ভাড়াটে চাষী বা টিন্যান্ট ফার্মার্স অর্থাৎ যারা অন্যের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে কৃষিকাজ করছে, তাদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে কৃষি মজুর বাড়ছে, অন্যদিকে কৃষি খামারের গড় আকার ছোট হয়ে আসছে। অর্থাৎ একদিকে জনসংখ্যার চাপে জমি ছোট হয়ে আসছে, অন্যদিকে কৃষি সেইভাবে আর লাভজনক নাই। সুতরাং কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে লাভ করার চাইতে বর্গা বা জমি ভাড়া বা লিজ দিয়ে লাভ করতে চাচ্ছে। সুতরাং যে লিজ নিচ্ছে তার পক্ষে কৃষিকাজের মাধ্যমে লাভ করে পুঁজিবাদী কৃষকে রূপান্তরিত হওয়া খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাছচাষের মত ননক্রপ সেক্টর বাড়ছে এবং শহর থেকে কিছু পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। কিন্তু সেই বিনিয়োগটা এতো বেশি প্রযুক্তিনির্ভর বা পুঁজিঘন, যে সেখানে কৃষি মজুরের বড় ধরনের সংযুক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং কোন শ্রেণিদ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং ননক্রপ খাতে আমরা পুঁজিঘন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই কৃষি সম্পর্কে ভূমিহীন শ্রেণিকে নিযুক্ত করার বিষয়টা ঘটছে না। যেটাকে মার্ক্সিস্ট লিটারেচারে বলা হচ্ছে, এক ধরনের লুম্পেন প্রলেতারিয়েত তৈরি হচ্ছে, যাদের কোন কাজ নেই, সে কর্মহীন বা বেকার থাকছে, এই ধরনের কৃষিমজুর তৈরি হচ্ছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট কৃষি উদ্বৃত্ত গ্রহণকারী শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, যারা কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত শোষণ করতে পারছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বড় না। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই লিজগ্রহণকারী অর্থাৎ যারা ভাড়া নিয়ে জমি চাষাবাদ করছে তাদের সংখ্যাও প্রচুর বাড়ছে। সুতরাং এই কাঠামোটাকে আমরা এক ধরনের মিশ্র কাঠামো হিসেবে অভিহিত করতে পারি, যেখানে পুঁজিবাদের সম্ভাবনা তৈরি হয়, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সেটা হয় না। সেখানে মানুষ কৃষিকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে, আবার ননক্রপ সেক্টরের একটা বিকাশ ঘটছে এবং সেখানে শহুরে পুঁজি ঢুকে যাচ্ছে। এভাবে আমরা বাংলাদেশের বর্তমান কৃষি কাঠামোটাকে মোটামুটি বুঝতে পারি।

শিল্পবিপ্লবের পরে ইংল্যান্ডের কৃষি কাঠামোতে ধ্রুপদী পুঁজিবাদ আবির্ভূত হয়েছিল, সে ধরনের কিছু কি এখানে হচ্ছে? কিংবা আমরা যদি পাশের দেশ ইন্ডিয়ার দিকেও তাকাই, সেখানে বেশ বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছে কৃষি কাঠামো। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাবে যেই ধরনের পুঁজিবাদী কৃষকশ্রেণি তৈরি হয়েছে তারা খুব শক্তিশালী ছিলেন। ১৯৮০-৯০ এর দিকে চরণ সিংহ

কিন্তু ওদের মধ্য থেকেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পাশাপাশি যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাই, সেখানেও অনেকটা বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোতে ঐতিহাসিক কতগুলো পরম্পরা আছে। একসময় এখানে জোতদার, মহাজন, আড়তদার ইত্যাদি শ্রেণির একটা প্রভাব ছিল। তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও ছিল। দেখা গেছে তারা সরাসরি জমি থেকে লাভ করেছে, কিন্তু সেটা সরাসরি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে নয়। উৎপাদকদের দায়িত্বটা তারা দিয়ে দিয়েছে বর্গাদার, ভূমিহীন অথবা প্রান্তিক কৃষকদের হাতে। তারা শুধু জমি থেকে লাভটা নিয়েছে। এতে কৃষি অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারণ কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ হয়নি। সুতরাং পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মন্থরতা ছিল, কৃষিতে প্রযুক্তি আনার ক্ষেত্রে মন্থরতা ছিল এবং এর মধ্য থেকেই আমরা সাবসিস্টেন্স বা খোরপোষ কৃষি বা বেঁচে থাকার জন্য চাষাবাদ করে এমন একটা শ্রেণি আমরা দেখতে পাই গ্রামে। তারা কখনো কখনো কৃষি মজুরদেরকে ভাড়া করে, তাদের হাতে কিছু উদ্বৃত্ত ফসল হয় এবং তারা সেটাকে বিক্রি করে। এই গৃহস্থকে আমরা পুঁজিবাদী কৃষক অর্থাৎ যারা পেশাগত প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে চায়, সেই রকমের শ্রেণি হিসেবে তুলনা করতে পারি না। এভাবে বাংলাদেশে আমরা পুঁজিবাদী কৃষক পাইনি, বা খুব কম বা খুব ছোট আকারে পাই। এর সাথে আমাদের জনসংখ্যার যে চাপ সেটার জন্য পারিবারিক জোতগুলো অর্থাৎ প্রত্যেকটা খামার বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে, বা ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটা পরিবারের যে জমি আছে সেখানে সে পুঁজি বিনিয়োগ করে জমি চাষ করে উদ্বৃত্ত তৈরি করবে, কিন্তু এভাবে তার কৃষিকাজ আরও সম্প্রসারিত করার মত জমিই তো সে পাবে না। জমি পাওয়া খুব কঠিন এবং সেটাই আমাদের কাঠামোগত একটি বড় সীমাবদ্ধতা। আমরা বাংলাদেশে সেই রকমের খুব বড় কৃষি উদ্বৃত্তশ্রেণী পাই না। বরং কৃষি মজুর তৈরি হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ভূমিহীনও বেড়েছে। যারা ভূমিহীন তারা কৃষিতে যেমন এসেছে, আবার তারা শহরেও চলে আসছে। এভাবে নতুন ধরনের একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ যারা ভূমিহীন বা কৃষি সর্বহারা, তারা একই সাথে কৃষি সর্বহারা এবং অকৃষি সর্বহারা। অকৃষি সর্বহারা বলতে তারা যখন কৃষিতে কাজ পাচ্ছে না, তারা শহরে চলে যাচ্ছে বা অন্যত্র চলে যাচ্ছে এবং অকৃষি কাজে যুক্ত হচ্ছে। আবার যখন দেখা যাচ্ছে যে কৃষিতে মজুরি বেড়ে যাচ্ছে, তখন তারা কৃষিতে ফিরে আসছে।

১৯৮০-র দশকে আফ্রিকাতে এই ধরনের কতগুলো কাজ হয়েছিল। তারা আর্টিকুলেটেড মোড অব প্রোডাকশন বলে একটা ধারণা তৈরি করেছিল। আর্টিকুলেটেড মোড অব প্রোডাকশন-এর মূল প্রতিপাদ্যই ছিল কেমন করে এই ধরনের একটা মিশ্র উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। মিশ্র উৎপাদন ব্যবস্থাটা কি? একই পরিবারের একটা অংশ গ্রামে থাকে, আর একটা অংশ শহরে থাকে, অর্থাৎ গ্রাম-শহর মিলিয়েই থাকে। এখানে গ্রাম এবং শহরের সম্পূর্ণ বিভাজন ঘটছে না। এখানে ধ্রুপদী কোন সর্বহারা শ্রেণি তৈরি হচ্ছে না। আমরা যদি এই ধরনের সর্বহারাদের নিয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রগতিশীল রূপান্তরের কথা চিন্তা করি, সেই ধরনের অবস্থা কিন্তু তৈরি হচ্ছে না। বাংলাদেশে কিন্তু এটা চরমভাবে হচ্ছে। সুতরাং মজুর এবং সর্বহারারা কৃষি এবং অকৃষির মধ্যে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে এবং সে এই দুটোর দ্বন্দ্বের সাথেই জড়িত। সে গ্রামীণ একটা দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত, আবার সে শহরের একটা দ্বন্দ্বের সাথেও জড়িত। সে কখনোই কোন চূড়ান্ত কোন অবস্থান গ্রহণ করছে না এবং রাজনৈতিক অবস্থানও সে নিচ্ছে না। সুতরাং যাকে আমরা সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন বলে থাকি, সেই ধরনের সমাজ বদলের আন্দোলনের সাথে সে যুক্ত হতে পারছে না। কারণ তার দুই ধরনের সম্পৃক্ততা আছে। এই প্রেক্ষিতে সমাজবদলের রাজনৈতিক দলগুলোকে এখনও কোন বৈপ্লবিক রূপান্তরণের বা র্যাডিকাল ট্রান্সফর্মেশনের দিকে যেতে দেখছি না। এমনকি কোন বৈপ্লবিক রূপান্তরের দিকেও সেই আন্দোলনটা আর নেই। আমরা জানি ষাট-সত্তরের দশকে বৈপ্লবিক রূপান্তরের যে দলগুলো কৃষি মজুরদের বা ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে কাজ করেছে, সেই ধরনের দলগুলো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং বিভিন্ন কারণে কমিউনিস্ট বা বামপন্থি আন্দোলনের সম্ভাবনাও এখানে দুর্বল হয়ে গেছে।

চীনে যে বিপ্লবটা হয়েছিল, সেখানে শহরকে গ্রাম দিয়ে দখল করা হয়েছিল। অর্থাৎ মাও সে তুং গ্রামের সর্বহারাদেরকে সংগঠিত করেছিলেন এবং সেখান থেকে তারা শহর দখল করেছিলেন, কারণ তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। আমরা পশ্চিমবাংলার কথা জানি, সেখানেও বামপন্থি আন্দোলনটা খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে বিকশিত হয়েছে। সিপিএম পার্লামেন্টারি কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে গেছে। কিন্তু সিপিআইএমএল পার্লামেন্টারি কমিউনিজমকে বাতিল করেছে এবং তারা সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে এগিয়েছে, কিন্তু তারা আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছে। সুতরাং এখনকার ট্রেন্ডটা হচ্ছে

পার্লামেন্টারি সোসালিজম বা পার্লামেন্টারি র্যাডিকাল পলিটিক্স তৈরি করা। সেই পার্লামেন্টারি র্যাডিকাল পলিটিক্স বাংলাদেশেও ব্যাপক প্রভাব তৈরি করেছে। পার্লামেন্টারি র্যাডিকাল পলিটিক্স-এর প্রধান চরিত্র হচ্ছে তারা শ্রেণিকার্টামোকে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাবে না। বরং পুঁজিবাদী কার্টামোকে টিকিয়ে রেখে তারা শ্রমিক শ্রেণি বা পিছিয়ে থাকা শ্রেণির সুযোগ সুবিধাকে আর একটু বাড়াতে চাইবে। এটাই হচ্ছে পার্লামেন্টারি কমিউনিজমের একটা বৈশিষ্ট্য, যেটাকে তারা সোসাল ডেমোক্রেসি হিসেবেও অভিহিত করতে চায়। সেখান থেকে কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেট অবধি আমরা সেটাকে নিয়ে যেতে পারি।

বাংলাদেশে গ্রামে যাদের জমি আছে, তাদের কৃষির প্রতি অনীহা তৈরি হচ্ছে। এই অনীহা তৈরির জন্য আমাদের ধ্রুপদী পুঁজিবাদী কৃষি বা একটা গ্রামীণ পুঁজিপতি শ্রেণি আবিস্কৃত হয়নি। তার বদলে যারা ক্ষুদ্র কৃষক, তারাই এই উদ্বৃত্ত তৈরি করেছে, তারা এটাকে শহরে পাঠিয়েছে এবং তারা কখনো বাইরে চলে যাচ্ছে ইত্যাদি। গ্রামীণ সর্বহারা শ্রেণির একধরনের যুগপৎ সম্পর্ক থাকছে এবং তারা গ্রাম এবং শহরকে মিলিয়ে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে। চূড়ান্তভাবে এখানে মূল সংগ্রামটা হয়ে যাচ্ছে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। অর্থাৎ বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং রূপান্তরের সংগ্রাম— এই দুটোর মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত সমন্বয় বা ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে, ততক্ষণ বৈপ্লবিক রূপান্তরণ করাটা খুব কঠিন। কারণ এখানে পুঁজিবাদী দ্বন্দ্ব বা শ্রেণি দ্বন্দ্ব থেকে শ্রেণি সংগ্রাম বা ক্লাস কনফ্লিক্টে যাওয়ার জন্য যে পুঁজিবাদী রূপান্তরণ প্রয়োজন, সেটা ধ্রুপদী পর্যায়ে ঘটছে না। অন্যদিকে যারা কখনও গ্রামীণ সর্বহারা, আবার কখনও শহরে সর্বহারা হিসাবে আছে, তারা টিকে থাকার সংগ্রামের মধ্যে থাকছে। আবার এর মধ্যে চলে এসেছে এনজিও, যারা কিনা বৈপ্লবিক রূপান্তরণের কথা বলছে, তারা গ্রামীণ দ্বন্দ্বকে প্রশমিত বা মিনিমাইজ করে দিচ্ছে। এভাবে তারা মোটামুটি একটা টিকে থাকার পরিস্থিতি তৈরি করে দিচ্ছে। এই টিকে থাকার দ্বন্দ্বের মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকছি। এভাবে আমরা পুঁজিবাদের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাচ্ছি, কিন্তু কোন বৈপ্লবিক রূপান্তরণের দিকে ঝুঁকছি না।

বাংলাদেশের বাম রাজনীতির দিকে যদি আমরা খেয়াল করি, তারা যেহেতু পার্লামেন্টারি কমিউনিজমের দিকে যাচ্ছে, এজন্য ইউরোপে আমরা যেমন বৈপ্লবিক রূপান্তর বা সশস্ত্র সংগ্রাম দেখেছি, সেটা বাংলাদেশে দুর্বল হয়ে

গেছে। তার সাথে আমাদের যুক্ত করতে হবে চীনের সাম্প্রতিক পরিবর্তন, অর্থাৎ মার্কেট সোসালিজমের বিষয়টি। এর পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর যে রূপান্তর ঘটেছে, তারা সমাজতন্ত্র থেকে রূপান্তর ঘটিয়ে আবার বাজারকে ঘিরে বেঁচে থাকছে। সুতরাং সবকিছু মিলিয়ে আমরা বাংলাদেশে যে কৃষি কাঠামো ও কৃষি রাজনীতি দেখতে পাচ্ছি, সেটা এক ধরনের কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মধ্যে যে অবস্থাটা আমরা দেখতে পাই, সেরকম দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। এর মধ্য দিয়ে যারা পশ্চাত্তপদ শ্রেণি, তারা তাদের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে বাড়াতে চাইবে, কিন্তু তারা কখনও বৈপ্লবিক রূপান্তরের দিকে ঝুঁকতে চাইবে না। কারণ সেটার জন্য যেই ধরনের প্রতিশ্রুতি দরকার, সেই ধরনের তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলো এখন পর্যন্ত খুব কম।

বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের কাছে জমি আছে, তারা তাদের জমি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। কারণ সে জানে যে গ্রামে প্রচুর পরিবার আছে, যারা সেই জমি লিজ নিতে চায় এবং লিজ নিয়ে তারা চাষ করবে। এভাবে জমির মালিক জমি থেকে আয় করবেন, তার আগ্রহটা হচ্ছে শহরে চলে আসা এবং সন্তানকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া। খুব বেশি যদি তার মধ্যে উদ্যমী মনোভাব থাকে, তাহলে হয়তো দেখা যাবে সে ননক্রপ যেমন, মাছচাষ, মুরগী পালন বা লাইভস্টকে সে যেতে পারে। তবে সব জায়গাতেই তার ঝুঁকি আছে। অর্থাৎ উদ্যোক্তার ঝুঁকি আছে। এ কারণে যার হাতে পুঁজি আছে, সে ভাবছে যে যতটা নিরাপদভাবে সে বিনিয়োগ করতে পারে। এই নিরাপদ বিনিয়োগের যে, আগ্রহ, সেটা কিন্তু কৃষি বিনিয়োগকে সাংঘাতিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। তার যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে শহরে চলে আসতে পারবে। কিন্তু শহরে আসাটা যে তার জন্য খুব সহজ তা কিন্তু নয়। এখানে একটা বড় বিনিয়োগ না করলে সে কিসে বিনিয়োগ করবে? সুতরাং সে বাধ্য হয়ে কৃষিতে কিছুটা বিনিয়োগ করে এবং তার মধ্যে থেকে সে বেঁচে থাকতে চায়।

আমরা দেখতে চাই এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে খুব বড় ধরনের পুঁজিবাদী কৃষি শ্রেণি আমরা পাচ্ছি কিনা? সেই হিসেবে বাংলাদেশে কোন বড় মাপের কৃষি পুঁজিবাদী শ্রেণি আমরা বিকাশ লাভ করতে দেখছি না। কারণ তার জন্য যে মেরুকরণটা দরকার, সেই মেরুকরণটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে জনতাত্ত্বিক বা ডেমোগ্রাফিক একটা কারণ কাজ করছে, অন্যদিকে এখন পর্যন্ত মুনাফার দিক থেকে কৃষিতে শিল্পের চাইতে মুনাফা

অনেক কম। তার চাইতে যদি সে টাকাটা মহাজনীতে খাটাতে পারে তার জন্য অনেক লাভ। এগুলো হচ্ছে অপুঁজিবাদী পথ। অর্থাৎ অপুঁজিবাদী পথ যদি পুঁজিবাদী বিনিয়োগের চাইতে লাভজনক হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে কেনো পুঁজিবাদে বিনিয়োগ করতে চাইবে?

ইন্ডিয়ান উত্তরাঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে আমরা লক্ষ্য করছি একটা পুঁজিপতি ক্লাস তৈরি হয়েছে। ইন্ডিয়াতে এই কৃষিজীবীরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কিছুদিন পরপর আপনারা লক্ষ্য করেছেন তারা রাজধানী ঘেরাও করছে, মিছিল করেছে, এটা করছে, ওটা করছে। সেইরকম একটা লবি কিন্তু বাংলাদেশে এখনো তৈরি হয়নি। আরেকটা হচ্ছে এর মধ্য থেকেই আমরা যাদেরকে গতানুগতিক কৃষক বলি, সেই গতানুগতিক কৃষক বাংলাদেশে আছে। চায়ানডের দৃষ্টিভঙ্গিতে গতানুগতিক কৃষক আমরা কাকে বলি? যার একটু জমি আছে এবং তার পরিবারের সদস্যরাই ওই জমিতে খাটে। সেখান থেকে তার নিজের বেঁচে থাকার জন্য যেসব দরকার সে তা পায় এবং একটা অকেশনাল সারপ্লাস, যেটাকে আমরা বলছি যে হঠাৎ তার উদ্বৃত্ত তৈরি হয় এবং সেটা সে বিক্রি করে। এটাই হচ্ছে সেই চায়ানডীয় গৃহস্থ, যাদেরকে আমরা কৃষক বলে অভিহিত করতে চাই। এখনও সেই ধরনের শ্রেণি আছে, একদম যে নাই তা না। কিন্তু তারপরে কি হবে? শহরে একটা প্রভাব তৈরি হবে। এসব কৃষকদের সম্ভাবনা লেখাপড়া শিখবে এবং তারা হয়তো শহরে চলে আসতে পারে, আবার হয়তো কেউ ওখানে থাকতেও চাইবে। মূল জিনিসটা হচ্ছে, কৃষি যখন একটা পণ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন কৃষক তার শিক্ষিত ছেলেকে কৃষিতে ফিরিয়ে আনতে চাইবে, যদি সে দেখে কৃষিটা অনেক লাভজনক হচ্ছে। সেই সম্ভাবনাটাকে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। আমাদের দেশের কৃষিতে সেই ধরনের ঘটনা ঘটতেও পারে ভবিষ্যতে। তবে গতানুগতিক কৃষকের পরিবর্তন হবে। নতুন কৃষক আমরা যাদেরকে বলছি, তারা অনেক চৌকস, তারা সবদিকে চোখ-কান খোলা রাখছে, তারা তাদের সম্ভাবনাদেরকে স্কুলে পাঠাতে চাচ্ছে, আবার তারা কৃষি থেকে লাভবান হতে চাচ্ছে, তারা বেঁচে থাকতে চাচ্ছে। এই ধরনের একটা কৃষক শ্রেণি আমরা এখন পাচ্ছি। এই শ্রেণিটাকে আমরা একেবারে গতানুগতিক শ্রেণি বলতে পারব না, যারা শিক্ষা থেকে দূরে, যারা রাজনীতি থেকে দূরে ইত্যাদি।

রাষ্ট্র সাংঘাতিকভাবে গ্রামে ঢুকে গেছে। গতানুগতিকভাবে আমাদের এখানে যে ক্ষমতা কাঠামো ছিল, যেমন সালিশ বা মাতবরদের প্রভাব, সেটাকে

প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি (বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বা উপজেলা পরিষদ পদ্ধতিগুলো) আচ্ছাদিত করেছে। এর ফলে আমরা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চগয়েত নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বামফ্রন্টের ইচ্ছাই ছিল গ্রামের রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা। অর্থাৎ গ্রামের রাজনীতিকে রাষ্ট্রের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করবে। সুতরাং সেখানে গ্রামের রাজনীতি আজ রাষ্ট্রের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনেক বেশি দলভিত্তিক হচ্ছে এবং সেখানে শহরের মানুষরাও যাচ্ছে।

সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, কৃষি আপেক্ষিকভাবে যতটা লাভজনক হবে, তত বেশি সেখানে পুঁজি যাবে এবং আমরা একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী শ্রেণি এখানে পাব। তার বদলে আমাদের এখানে কৃষকের বেঁচে থাকার বা টিকে থাকার সংগ্রামটা প্রধান। সেটাকে যদি সে ছাপিয়ে উঠতে পারে, তাহলে সে কৃষিতে আরো লাভজনক উপার্জন চাচ্ছে। এমন নয় যে এটা শিক্ষিত কৃষকের জন্য লজ্জাজনক কোন ব্যাপার। কারণ এখন ইউনিভার্সিটি পাশ করে অনেক ছেলে মাছচাষ করছে। সে হয়তো শার্টপ্যান্ট পরে ওখানে যাচ্ছে, সে হয়তো আগের কৃষকের মত লুঙ্গি পরে যাচ্ছে না। সুতরাং এখানেও একটা প্রতীকি রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। কৃষিতেও এক ধরনের প্রতীকি রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে এবং সেখানে সামাজিক মর্যাদার জটিলতার দিক থেকে সে এক ধরনের জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি চ্যানেল আই টেলিভিশন-এর শাইখ সিরাজকে। তিনি দেখাচ্ছেন কেমন করে কৃষি ক্রমাগত একটা পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে পাশ্চাত্যের মতো জিন্স পড়া, মাথায় টুপি দেওয়া কৃষক আসছে, যে কিনা এক সময় ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়েও খাচ্ছে। সুতরাং এমন কৃষক হয়তো বাংলাদেশে তৈরি হবে, যে হয়তো শহরে গিয়ে ফাইভ স্টার হোটেলে খায়, আবার গ্রামে গিয়েও সে হয়তো চাষাবাদের সাথে যুক্ত হয়। তার পরনে লুঙ্গি থাকে না, জিন্স প্যান্ট থাকে। সেই সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু আমাদেরকে বারবার দেখতে হবে, যেহেতু আমরা প্রতিনিয়ত একটা গতিশীলতা বা কন্টিনিউয়াস ইভলভিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে যাই এবং সেখানে শিল্পের সাথে কৃষি খাতের প্রতিযোগিতা থাকে, তার সাথে আবার বৈশ্বিক উষ্ণায়ন যুক্ত হয়েছে এবং নতুন নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসেছে। সুতরাং এতগুলো ডায়নামিক্সকে নিয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং

আমাদেরকে উনবিংশ শতাব্দীর যে ব্রিটেন তার ফ্রেমওয়ারকে যে কৃষিজ পুঁজিবাদ, সেই ফ্রেমওয়ার্ক কিন্তু এখন চলবে না। কিংবা গত শতাব্দীর ষাটের দশকের হলেও চলবে না। আমাদেরকে এখনকার লেন্স দিয়ে বিষয়টাকে বুঝতে হবে।

মুক্ত আলোচনা

আবুল বারাকাত (অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) : মূলত বিষয়বস্তুর কারণে এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার আগ্রহ পাই। জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন, *দি রিজনেবল ম্যান অ্যাডাপ্টস হিমসেলফ টু দ্যা ওয়ার্ল্ড, দি আনরিজনেবল ওয়ান পারসিস্ট টু ট্রাইং টু অ্যাডাপ্ট দ্যা ওয়ার্ল্ড টু হিমসেল্ফ, দেয়ারফোর অল থ্রোস ডিপেন্ডস অন দ্যা আনরিজনেবল ম্যান*। আজকে আমি একটা *আনরিজনেবল ম্যান* খুঁজছিলাম, যে উৎপাদন পদ্ধতি আলোচনা করবেন মার্ক্সিয়ান বা অন্য কোন ফ্রেমওয়ারকে। অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান মার্ক্সিয়ান ফ্রেমওয়ারকেই আলোচনা করেছেন। আমরা বহু বছর ধরে, বিশেষ করে আশির দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে মোড অফ প্রোডাকশন বা উৎপাদন পদ্ধতি কী এই বিতর্ক করেছি। সেসময় খুব ভাল আলোচনা হত। এই বিতর্কে যারা অংশগ্রহণ করতেন, তাদের মধ্যে কেউ বলতেন আধা সামন্তবাদ, কেউ বলতেন সামন্তবাদ, আবার কেউ বলতেন আধা-পুঁজিবাদ। আখলাকুর রহমান একদম পুঁজিবাদের দিকেই আলোচনা নিয়ে গেছিলেন। আবু আব্দুল্লাহর মত অনেকে চায়ানভের ক্ষুদ্রে কৃষকের দিকে ঝোঁক দিতেন। আমাদের আগ্রহের বিষয়টা ছিল, বাংলাদেশের কৃষিতে শ্রেণি সম্পর্ক বা উৎপাদন পদ্ধতি কী, সেটা জানার চেষ্টা করা। কারণ একটা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পার হওয়া এই দেশে দুটো জিনিস আমরা চেয়েছি: ১. বৈষম্যহীন দেশ ও অর্থনীতি, এবং ২. অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো বা সেকুলার মাইন্ডসেট। এই দুটোর কোনটাই হয়নি। আমরা এই দুইটি জিনিস জানতে চেয়েছিলাম কৃষিকে কেন্দ্র করে। কারণ, সত্তরের দশকে কৃষির বাইরে তেমন কোন কিছু আর ছিল না। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে, আমরা তখন নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি (dominant mode of production) খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। আজকে যেটা বলা হল, সেটা কেউ কেউ তখনও বলছিলেন যে এখানে ফিউডালিজমও না, ক্যাপিটালিজমও না, কোন ডমিনেন্ট মোড অফ প্রোডাকশন এখনও তৈরি

হয়নি। এটাকে মাল্টি-স্ট্রাকচারাল ইকোনমিক সিস্টেম বলা হয়েছে। দুই-এক জন তখন এটা বলেছেন। আজকে আমি যেটা দেখতে পারছি, সেটা হচ্ছে মাল্টি-স্ট্রাকচারাল উৎপাদন পদ্ধতি, যেখানে কোন মোড অফ প্রোডাকশন ডমিনেন্ট না। এই ধরনের একটা উপসংহার দেওয়া হচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে যে, কৃষিতে বেঁচে থাকার সংগ্রামই বড় সংগ্রাম, এরপর ট্রান্সফরমেশনের বিষয় এবং কেন হচ্ছে না ইত্যাদি।

আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে, গত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে খামারের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে বেড়ে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখের অধিক হয়েছে এবং ফ্রাগমেন্টেশনের ফলে খামারের আকার দ্রুত কমেছে। ০.৮৮ হেক্টর থেকে কমে ০.৩৩ হেক্টর হয়েছে অর্থাৎ খামারের আকার হয়েছে খুব ছোট। এই ছোট আকারের খামারের ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসবে যে, এই ক্ষুদ্র কৃষক খামার বদলে গিয়ে বৃহৎ পুঁজিবাদী খামার হতে পারবে কি না? উত্তর হচ্ছে, আপাতত হতে পারবে না। এর অনেকগুলো উত্তর এখানে আলোচনা করা হয়েছে, জনসংখ্যাকে একটা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখানো হয়েছে, যা আমি মনে করি ঠিক। যে কারণে কৃষিতে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন (Extended reproduction) নাই, যা পুঁজিবাদের প্রধান লক্ষণ, সেটা নাই। সেটা যতক্ষণ নাই, ততক্ষণ ওখানে পুঁজিবাদী আধিপত্যমূলক উৎপাদন পদ্ধতি হবে না, এবং আমার ধারণা এই রূপান্তরণ হয় সীমিত বা অতি ধীর। এর কারণ হচ্ছে, খণ্ড-বিখণ্ড জমির প্লটগুলোর একত্রীকরণে বেচা-কেনার উচ্চমূল্য। বাংলাদেশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না যে খণ্ড খণ্ড প্লট কোন একটা পদ্ধতিতে একত্রিত হচ্ছে, বা বড় আকারের খামার তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও ছোটখাট উদাহরণ থাকলেও এটা এরকম নয় যে এর ভিত্তিতে বলা সম্ভব সামনে ২০-৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের কৃষিতে পুঁজিবাদ নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি হবে। তা যদি না হয়, কৃষিতে যে বিশাল জনগোষ্ঠী আছে, ২০৫০ সাল নাগাদ কমে কমে তা ৬০ ভাগের কাছাকাছি হবে। অবশ্য তা নির্ভর করছে গ্রামীণ বলতে কী বোঝায়, এর উপর। সংজ্ঞা পরিবর্তন করে সব শহরে জনগোষ্ঠী বানিয়ে ফেললে ভিন্ন কথা। কিন্তু বাস্তবে এটা হবে না। তাহলে আমাদের সম্ভবত দেখা দরকার, কৃষিতে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা হয়, এটা কোথায় যায়? এবং অন্য খাতের উদ্বৃত্ত কৃষিতে যায় কিনা? আর কৃষিতে শ্রম শক্তির যে চরিত্র, সেটা দেখা। আর শিল্পায়নের বিষয়টা দেখা দরকার। আমাদের দেশে যে

শিল্পায়ন, এটা ক্যাসিকাল শিল্পায়ন নয়। ব্রিটেনের শিল্পায়ন ছিল ক্যাসিকাল, যেখানে গ্রাম থেকে শহরে মাইগ্রেশন হয়, পাশাপাশি শিল্পায়ন হয়। আমরা যেটা দেখছি, গ্রামীণ থেকে শহরে মাইগ্রেশন হচ্ছে মূলত: ফোর্সড এবং ইনফর্মাল সেক্টরে। এত কিছু মধ্য আমার ধারণা, কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। আমি যেটা বললাম সেটা যুক্তিযুক্ত কিনা অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম যদি এ বিষয়ে কিছু বলেন।

মনিরুল ইসলাম খান : ধন্যবাদ। আপনি যেটা বলেছেন সেটা তো অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। আমার বক্তব্য ছিল মূলত আমাদের কাছে যেসব বইপত্র আছে সেগুলোর বক্তব্যের সংমিশ্রণ। মোটামুটি স্বনামধন্য লেখকদের বক্তব্য জড়ো করলে এরকম জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে মার্ঠভিত্তিক ইমপেরিয়াল এক্সারসাইজ করে সেখান থেকে একটা উপসংহারের চেষ্টা করা। এখানে আমি আমার নিজস্ব মার্ঠভিত্তিক উপাত্তের ভিত্তিতে কোন বক্তব্য হাজির করিনি। আমি হাজির করতে চেয়েছি, সেকেন্ডারি লিটারেচারগুলো থেকে আমরা কী ধরনের উপসংহারের দিকে যেতে পারি সেটা। আমার বক্তব্যের মধ্যে কতগুলো ক্রিটিক্যাল ইস্যু আমি উত্থাপিত করেছি। প্রথমত হচ্ছে, যদি আমরা ধরে নেই যে কৃষিকাঠামোর মধ্যে একটা ঐতিহাসিকতা থাকবে, অর্থাৎ আমার পূর্ববর্তী কাঠামোর একটা বড় রকমের প্রভাব থাকবে উদীয়মান কাঠামোর উপর। তা সেটা একধরনের পূর্বশর্ত হতে পারে। ঐ পূর্বশর্ত কী ধরনের বোঁক তৈরি করেছে? এটা আমি বলতে চেয়েছি যে, ঐ পূর্বশর্তটা নন-ক্যাপিটালিস্ট বোঁকই তৈরি করেছে। সেটাকে আমরা আধা-সামন্তবাদ বা যাই বলি না কেন? যারা বলছেন যে, আমাদের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত সাংঘাতিক রকম অ-পুঁজিবাদী, তাদের মতে এটা বড় রকমের বোঁক তৈরি করবে। যেমন মার্ক্স বলেছিলেন, আদর্শবিরোধী পুঁজি (Anti-idelubial capital), যেমন মহাজনী পুঁজি থাকলে এর মাধ্যমে লাভ করাটা এত সহজ হয়ে যাবে যে, ইন্টারপ্রিনিয়র ক্যাপিটালে অর্থাৎ উদ্যোক্তা পুঁজিতে যেতে চাইবে না। খাটিয়ে টাকা আনতে চাইবে না, যেটা কৃষিতে আরও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। অর্থাৎ আমাদের প্রিকন্ডিশনটা পুঁজিবাদে রূপান্তরণের জন্য উপযোগী নয়।

দ্বিতীয় যেটা বলা যায়, যেটা কিনা ভারতে ব্যাপকভাবেই হয়েছে, সেটা হচ্ছে সবুজ বিপ্লবের ধাক্কা। ভারতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও (মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব একভাবে যাচ্ছে, অন্যদিকে বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা

এরা ভিন্নভাবে এগোচ্ছে), সার্বিকভাবে সবুজ বিপ্লব পুঁজিবাদী রূপান্তরণে বড় ভূমিকা রেখেছে। আপনি নিজেও যেটা বলেছেন যে, ক্যাসিকাল ট্রানজিশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন মোটামুটি একটা প্রণোদনা তৈরি করেছে কৃষিকেও পুঁজিবাদের দিকে নিতে। সেটাও বাংলাদেশে অনুপস্থিত।

এখন যদি আমরা বলি বাংলাদেশ একটা নিওলিবারেল ইকোনমি নির্ভর দেশ, তো স্বাভাবিকভাবেই তখন তর্ক থাকবে না যে এটা পুঁজিবাদ কিনা। কারণ যখন আপনি নয়া-উদারতাবাদ বলবেন, তখন তো আপনি ধরেই নিচ্ছেন যে এই দেশে পুঁজিবাদ চলে এসেছে। যদি বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নয়া-উদারতাবাদের দিকে চলে গিয়ে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমীকরণটা তৈরি হবে যে এই নয়া-উদারতাবাদী অর্থনীতি কৃষিকে কিভাবে দেখতে চায়? সেটা বাংলাদেশের ফিউচার ডাইনামিক্সের একটা ডাইরেকশনাল ক্যারেক্টার তৈরি করবে। এখন নিওলিবারেল ক্যাপিটালের বড় রকমের ঝাঁক বা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গ্লোবাল ক্যাপিটাল এর মধ্যে ঢুকে যাওয়া। যেমন, মহারাষ্ট্রে কৃষকদের আত্মহত্যা। সুতরাং নয়া-উদারতাবাদী পুঁজিও যে পুঁজিবাদী রূপান্তরণকে সহজ করবে, তা আবশ্যিক নয়। অন্তত ইন্ডিয়ার উদাহরণ সেটাকে জাস্টিফাই করেছে না। এর পাশাপাশি ডেমোগ্রাফিক পার্থক্যতো আছেই। একেবারে প্রযুক্তিগত পয়েন্ট থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন, এই জিনিসটা হচ্ছে।

এখানে আমি সামাজিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষিত থেকে একটা পয়েন্ট যুক্ত করবো, একদিকে আছে কাঠামোগত রূপান্তরণ, অন্যটা হচ্ছে সচেতনতার রূপান্তরণ। যেমন আমাদের এখানে পুঁজিবাদের নামে প্রচুর কনজিউমারিজম বা ভোগবাদ তৈরি হয়েছে। মার্কসীয় প্যারামিটার থেকে যদি অন্য সোশ্যাল প্যারামিটারে যাই, তাহলে দেখা যাবে গ্রামাঞ্চলেও প্রচণ্ড রকমের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বাড়ছে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী মনন তৈরি হচ্ছে। এটা আমাদের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় নিয়ে আসতে পারি যে, পুঁজিবাদী মনন এখানে কী পরিমাণ তৈরি হচ্ছে? হয়তো সেটা অপূর্ণ পুঁজিবাদ, কিন্তু সেটা পুঁজিবাদী মনন তৈরি করেছে। এখন এই পুঁজিবাদী মনন অপূর্ণ পুঁজিবাদকে কতটা পরিপূর্ণ পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে যাবে, সেটা হয়তো আমাদের ভবিষ্যতে দেখবার বিষয়। তবে প্রধানত আপনি যেসমস্ত কথাগুলো বলেছেন, তার সাথে আমার কোন দ্বিমত নেই।

আবুল বারাকাত: বাংলাদেশে আমি সার্বিকভাবে ক্যাসিকাল ক্যাপিটালিজমের পরিবর্তে রেন্ট সিকিং ক্যাপিটালিজম দেখতে পাই। এটি নিজে কোন সম্পদ তৈরি করে না, অন্যের সৃষ্ট সম্পদ দখল-বেদখল-জবরদখল করে। এই রেন্ট সিকিং পুঁজিবাদ যদি আমাদের প্রধান প্রবণতা হয়, তাহলে কৃষিতে যে পুঁজিবাদ গ্রহণ করতে পারে সেটা তো সাব-সারভেন্ট টু রেন্ট সিকিং ক্যাপিটালিজম হবেই। অর্থাৎ কোনভাবেই ক্যাসিকাল পুঁজিবাদ হবে না, অন্য কিছু একটা হবে। সেটাকে আবার সম্ভবত আপনার উল্লেখিত সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ বা মেন্টাল ফ্রেমওয়ার্ক সাপোর্ট করে। এটা সম্ভবত খুব লজিক্যালি খাপ খায়।

মনিরুল ইসলাম খান: নিশ্চয়ই। এখানে কারও ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা নেই যে, আমি বাংলাদেশকে বিপ্লব পুঁজিবাদী দেশে রূপান্তরিত করবো। এটা জাতীয় বুর্জোয়াদের থাকে, তারা শুধু তাদের ব্যক্তিগত লাভ চায় না, একটা জাতীয় গর্ব তৈরি করতে চায়। এর মধ্যে সে এক ধরনের একমপ্লিসমেন্ট দেখতে পায়। এটাকে আমরা বলছি জাতীয় বুর্জোয়া। স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করি জাতীয় বুর্জোয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘটিয়েছে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যাদের মধ্যে পুঁজিবাদী আকাজক্ষা ছিল বা বঞ্চনা অনুভব করেছেন, তারই প্রতিফলন মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ। পরবর্তীতে ১৯৭২-৭৫ এর যে রূপান্তরণ সেটা ছিল সোশ্যালিস্ট, যেমন রেহমান সোবহান বলছেন এটা ছিল সোশ্যালিস্ট ক্যাডার ছাড়াই সোশ্যালিস্ট ট্রান্সফরমেশন এবং তাদের চেষ্টা ছিল সোশ্যালিস্ট ক্যাডার তৈরি করা। কিন্তু ১৯৭৫ এর ডিসেম্বরেই প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেল। অন্যদিকে ১৯৭৪ সালে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট এর সিলিং বাড়ানো হয়। তৎকালীন সরকারের মধ্যে ১৯৭২ থেকেই প্রচণ্ড রকমের বিতর্ক ছিল যে আমরা মিশ্র অর্থনীতিতে যাব, না ন্যাশনালাইজেশন ও সোশ্যালিস্ট অর্থনীতির দিকে যাব। সুতরাং বাংলাদেশের যে ক্যাপিটালিস্ট ঝাঁক সেটার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ আন্দোলনকে দেখতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে পপুলিস্ট বলা হয় এবং তিনি জনগণের দিকে গিয়েছেন। তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী এম আর সিদ্দিকী যেমন ক্ষোভ থেকে বলেছিলেন যে, তিনি যখন বিদেশে ছিলেন তখন ন্যাশনালাইজেশনের বিলটা কেন চূড়ান্ত করা হল? বাংলাদেশে যাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা থাকবে, অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্মাণের লক্ষ্য থাকবে, বিড়লা বা টাটাদের মত, অর্থাৎ শুধু নিজেকে তৈরি করা না, দেশকেও তৈরি করার চেষ্টা। এই দেশাত্মবোধভিত্তিক যে পুঁজিবাদ সেটি

বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা নাই। কারণ বাংলাদেশে যদি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া তৈরি হয় বাংলাদেশের গার্মেন্টস বা অন্য খাতের মধ্যে দিয়ে, তাহলে প্রশ্ন আসবে এত মানি লভারিং তাহলে কিভাবে হচ্ছে? এটা একটা বিপরীতধর্মী অবস্থান তৈরি করবে। যে বুর্জোয়া এখন বিকশিত হচ্ছে গার্মেন্টস বা অন্য খাতে, তাদের মধ্যে রেন্টসিকিং এর সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু আরেকটা বিষয় হচ্ছে, রেন্ট সিকিং ক্যাপিটাল যদি গ্লোবাল ক্যাপিটালের সাথে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তখন তাকে কতটা জাতীয়তাবাদী হতে হবে? ধরা যাক আপনি চিনি আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু এতে কৃষক মারা যেতে পারে, ফলে আপনি আবার আমদানি না করার সিদ্ধান্ত নিলেন বা সুরক্ষার দিকে চলে গেলেন। বাংলাদেশে এরকম একটা সুরক্ষিত ক্যাপিটালিজম কিভাবে হবে? যদি রেন্ট সিকিং পুঁজিবাদ বৈশ্বিক পুঁজিবাদের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়, তখন তাকে আবার কতটা জাতীয়তাবাদী পরিসরের দিকে যেতে হবে সেটা একটা খোলা প্রশ্ন। তবে বর্তমান প্রবণতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, রেন্ট সিকিং বা ফাটকাবাজি পুঁজির একটা সম্ভাবনা আছে, আবার এক্ষেত্রে ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্বও দরকার। সার্বভৌম ভূখণ্ড ছাড়া বুর্জোয়া বিকশিত হতে পারে কিনা সেটা আপনি ভাল বলতে পারবেন। যদি সার্বভৌম ভূখণ্ড দরকার হয়, তাহলে রেন্ট সিকিং ক্যাপিটালকে কিছুটা হলেও জাতীয়তাবাদী পুঁজিবাদের দিকে ঝুকেতে হবে এবং তাকে ট্যারিফ বা এ ধরনের বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে আরও বিতর্ক করতে হবে।

ড. মোঃ নাজিম উদ্দিন: আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, বিগত ২০-২৫ বছরে কৃষির রূপান্তরের ক্ষেত্রে, এটা খোরপোষের কৃষি থেকে লাভজনক বা পুঁজিবাদী কৃষির দিকে অনেকটা এগিয়েছে। আমাদের কৃষিতে ৩টি ভাগ: ফসল চাষ, গবাদিপশু পালন ও মৎস্য খাত। গবাদিপশু খাত পুরোপুরি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে চলে গেছে, এখন কেউ হালচাষের জন্য গরু পালে না, বরং বছর শেষে লাভ হবে এই জন্যে গরু পালন করে। এখানে ছোট-বড় নানা বিনিয়োগকারী আছেন এবং এটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাছের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে এই খাত মূলত প্রাকৃতিক জলাধার থেকে মৎস্য আহরণের উপর নির্ভরশীল ছিল। এখানে জেলে বা নিলু আয়ের মানুষ কাজ করতো, বিনিয়োগের কোন সুযোগ ছিল না। এখন এটা অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে বিনিয়োগনির্ভর হয়ে গেছে। এছাড়া ফসল

চাষের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সাব-কম্পোনেন্ট আছে। ধান বাদে ফল, সবজি, ফুল এবং কিছু দানাশস্যের ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ-রিটার্ন বেড়েছে। এই খাতগুলো যোগ করলে দেখা যায় যে আমাদের কৃষির রূপান্তরগণা পুঁজিবাদ অভিমুখী। এক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কটা কলকারখানার মত না হলেও, নানা ধরনের পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়ন দেখা যাচ্ছে। এই লক্ষণগুলোকে সূচক হিসাবে ধরে নিয়ে, আমরা কি বলতে পারি না যে, বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির যে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তা পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকেই যাচ্ছে?

ড. শামসুল বারি (চেয়ারম্যান, রিইব): আমরা তো মূলত কৃষকদের সাথে কাজ করছি। আজকে যেসব গুণীজন উপস্থিত আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশেষজ্ঞ এবং নানা ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। রিইব-এর কাজ সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে জানতে পারলে ভাল হত।

মনিরুল ইসলাম খান: ড. নাজিম উদ্দিন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং কমনসেন্সের প্রেক্ষিতে একটা উপসংহারের দিকে যেতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনি যেহেতু উপসংহার হিসাবে একটা কনসেপচুয়াল ক্যাটাগরি পুঁজিবাদে যেতে চাচ্ছেন, তাহলে একটা লজিক্যাল কানেকশন লাগবে। যেমন অধ্যাপক আবুল বারাকাত সিম্পল রিপ্ৰোডাকশন এবং এক্সটেনডেড রিপ্ৰোডাকশন এর উদাহরণ দিয়েছেন বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ায় পুঁজিবাদের বিতর্কের ক্ষেত্রে। বড় বড় অর্থনীতিবিদরা এই বিতর্কটা করেছেন। যাই হোক এখন মানুষের মধ্যে একটা বাজার-মানসিকতা তৈরি হয়েছে। আমরা একমত হচ্ছি যে, মানুষ এখন লাভ করতে চায়। অবশ্য এটা বহু আগে থেকেই মানুষ লাভ করতে চায়, বিশেষত ব্রিটিশরা যখন পাট বা আঁখকে অর্থনীতিতে ঢুকিয়েছে। সেসময় মানুষ সেটা নিয়েছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে লাভ করার আগ্রহ নাই, সেটা আমরা বলছি না।

ধরা যাক, আমি ৪০ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি, আমাকে যদি কেউ বলে যে তুমি একজন ভাল ব্যবসায়ী হও, সেটা আমার জন্য কঠিন হবে, কারণ এজন্য যে কাঠামোগত প্রিকন্ডিশন দরকার সেটা আমার নাই। এখন বাংলাদেশের যারা কৃষক, তারা যে লাভ করতে চায় না, সেটা আমরা বলছি না। কিন্তু আমার হাতে যে পুঁজি বা টাকা বা জমি আছে, আমি কিভাবে সেখান থেকে লাভটা তুলে নিব? এটা কী আমি নিজে চাষ করে ও বাজারে বিক্রি করে উদ্ধৃত্ত তুলে নিব? নাকি পারিবারিক শ্রম লাগিয়ে করবো, নাকি

বাজার থেকে শ্রম ক্রয় করব? যদি আমি আমার পারিবারিক শ্রম দিয়ে উৎপাদন করতে পারি, তাহলে কেন বাজার থেকে মজুর ভাড়া করব? অর্থাৎ এটাই হচ্ছে মূল আলোচনা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, যে আমি কী চাই না চাই এটা সেকেভারি বা পরের ব্যাপার। অন্যদিকে আমি কী করতে পারবো বা পারবো না, আমরা ঐদিকে আলোচনাটা নিতে চাচ্ছিলাম। এখানে অসম্পূর্ণতা অবশ্যই আছে। আমি বলেছি, মানুষের মধ্যে এক ধরনের লাভ করার বা প্রফিট-মেকিং সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে এনজিও-রা মুরগি পালন, গরু মোটাজাকরণ, নারীদের বাজারে প্রবেশাধিকার ইত্যাদিতে কাজ করেছে। এনজিও মডেলে এক ধরনের নব্যউদারনৈতিক পুঁজির প্রবেশ হয়েছে বা এনজিওরা বাংলাদেশে বাজারের পেনিট্রেশন করিয়েছে। এটা আরেকটা বিতর্ক যে, এনজিও-রা কি সোশ্যাল সার্ভিস দিয়েছে, নাকি পুঁজি ইনফিউশন ও নিওলিবারেলিজম ঢুকিয়েছে। সুতরাং সব দিক থেকে ঝাঁকটা ঐদিকে। আমরা এখানে এক্সটেনডেড রিপ্ৰোডাকশন বা সিম্পল রিপ্ৰোডাকশন মাপিনি। কিংবা আরও বিভিন্ন যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলোও দেখা হয় একাডেমিক উপসংহারে পৌছানোর জন্য। আপনার পর্যবেক্ষণের মধ্যে তীক্ষ্ণতা আছে এবং আমি মোটেও খাটো করছি না। আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে চেয়েছেন। তার সাথে আমরা দ্বিমত করছি না। কিন্তু আমরা বলছি যে, এই পুঁজিবাদকে কিভাবে চরিত্রায়ন করব? এর ইনটেনসিটি, প্রাভারিৎ, গ্রোথ, ইন্টারনাল ডাইনামিক বা অন্যান্য সম্পর্ক কেমন ছিল ইত্যাদি দেখা। তবে আমরা একমত যে, বাংলাদেশে গ্রামে ও শহরে একটা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে। এর একটা প্রভাব আছে। আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এটাই আমার উত্তর।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ চিরন্তন কিছু বিষয়কে তুলে এনেছে। আপনাদের বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনের সময় আমার মনে প্রশ্ন জাগতে যে, বাজারমুখী কৃষকরা কতটা অবাজারমুখী হবেন? দেশী বীজে যদি ফলন কম হয়, তাহলে কেন উফসি করবো না? সেখানে নানা ধরনের টুকরো টুকরো যৌক্তিকতা তৈরী হয়। দেখা যায়, পরিবারের জন্য নিরাপদ কৃষি করি, আবার বাজারের জন্য রাসায়নিক কৃষি করি। তখন আমি নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করিনা। এইটা খুব ইন্টারেস্টিং, আপনাদের কাজের মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস সামনে এসেছে, সেটা হচ্ছে এখনকার সবচেয়ে বড় সংকট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পুঁজিবাদ কী টিকবে? পুঁজিবাদ যেভাবে

প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর হয়েছে, প্রাকৃতিক বীজকে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক বীজের যে রিজিলিয়েন্স, তা উফসী বীজে আছে কিনা? এটা অনেক বড় প্রশ্ন। এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। আমি মনে করি, আপনারা হয়তো পুঁজিবাদের ইন্টারনাল দুর্বলতাগুলো, অর্থাৎ তা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে প্রযুক্তি দিয়ে টেকসই হতে পারবে কিনা, এই বিষয়গুলো সামনে আনবেন।

শামসুল বারি: বিগত ২০-২৫ বছরে চোখের সামনে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। এবার নওগাঁতে দেখলাম পুরো জেলা আম গাছে ভরে গেছে, এগুলো মূলত ধানক্ষেত ছিল। এই পরিবর্তন কৃষকরা করছেন, কারণ তার আয় বাড়ছে, কিন্তু এখানে সরকারের নীতিগত ভূমিকা কী, সেটা যদি আবুল বারাকাত আলোচনা করেন।

আবুল বারাকাত: অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান প্রথমই একটা কথা বলেছিলেন যে, যে কোন দেশে পুঁজিবাদ তৈরির ক্ষেত্রে একটা সার্বভৌম ভূখণ্ড প্রয়োজন হয়। আমার ধারণা, এ ধরনের কোন সার্বভৌম ভূখণ্ড আর নাই। কারণ, বৈশ্বিক পরিসরে যে পুঁজিবাদ আমরা দেখি, সেটাও রেন্ট সিকিং পুঁজিবাদ। তিনটি জিনিস এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ: ১. বৈশ্বিক রেন্ট সিকিং পুঁজিবাদ, ২. বিশ্বায়ন- এটা যেভাবে বলা হয়েছিল সেভাবে কাজ করেনি, পুঁজিবাদ যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণ করতে পারেনি, বরং যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়নি, সেগুলো পূরণ করে ফেলেছে, এবং ৩. উচ্চ প্রযুক্তি ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এই তিনটি বিষয়কে একত্র করলে আমার ধারণা আমাদের পুঁজিবাদ বিষয়ক ভাবনায় অনেক পরিবর্তন আসতে পারে।

বারি স্যারের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা যায়, কোন ধরনের প্রণোদনা ছাড়া কৃষকদের ধানী জমি আমবাগানে রূপান্তরিত হয়নি। আমরা দেখেছি যে, ফসল চাষের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রণোদনা নেই। কিন্তু সরকারি অর্থনীতিবিদরা বলবেন এত পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। ভর্তুকি ঠিকমত হিসাব করলে দেখা যাবে ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছে এর কম অংশই পৌছেছে। আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে, বাংলাদেশে বিগত ৫০ বছরে প্রতি বছরের জাতীয় বাজেট ৪টি ক্যাটাগরির মানুষের কাছে কিভাবে পৌছেছে এটা নিয়ে একটা বই লিখেছি, যার নাম *অজনগণের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। এর মূল বিষয়, জনগণ কিভাবে অজনগণ হয়ে গেছে। বিগত ৫০

বহুরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কারের আলোকে এটি লেখা হয়েছে। এগুলোর বিপরীতে বাজেটে কত বরাদ্দ ছিল তার কোন হিসাব নাই। এই হিসাবটা কয়েক বছর ধরে আমরা করেছি। এই চার ক্যাটাগরির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষ কখনও জনগণ হতে পারেনি। অথচ দেশটা স্বাধীন। দেশের সংবিধানের ৭(১) ধারা বলছে, জনগণই হবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক। জনগণ যদি মালিক না হতে পারে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা অজনগণ (unpeople)। এই প্রপঞ্চটি আমার নয়, এটি নোয়াম চমস্কির। উনি এটা ধার করেছেন *আনপারসন* থেকে। তাহলে এই মানুষরা যখন নাগরিক হতে পারেননি, তখন ধানের জায়গায় আম-জাম গাছ ইত্যাদি দেখা যাবে। আর তখনই বোঝা যাবে যে, ধান বা ফসল চাষ আর লাভজনক নেই। নাজিম উদ্দিন বলেছেন, পশুসম্পদ ও মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে। আসলে এই দুটো খাত কৃষির মধ্যেও একটি বাণিজ্যিক বিষয়। কিছুদিন আগে অর্থনীতি সমিতির ময়মনসিংহ আঞ্চলিক সম্মেলনে, একজন অধ্যাপক বললেন যে, বাংলাদেশে পশুসম্পদ পুঁজিবাদের দিকে যাচ্ছে। আমি ঐ সেশনের সভাপতি হিসাবে আমার প্রশ্ন ছিল, আমাদের কাঠামোতে কয়টা পশু থাকলে লাভের হার বাড়তে থাকবে, তারপর আবার কমবে (ইউশেপড কার্ভ)? আমার মতে ১০টার বেশী হলে প্রফিট কমতে থাকবে। তাহলে আমাদের পুঁজিবাদ ঐটুকু। আরও লাভ করতে হলে প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হবে। কিন্তু প্রযুক্তি আপনাকে এই সুযোগ দেবে কিনা এখানকার প্রেক্ষাপটে। আর যদি সার্বভৌম ভূখণ্ড থাকে, তাহলে আপনি এটা পেতে পারেন। কিন্তু এটাই তো পাওয়া যাবে না। এরকম যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে আপনি বিশ্বায়নের বাইরে স্বাধীনভাবে এক্সিস্ট করছেন, যেটা সত্য নয়। এখানে আপনি এস আলম আর হিরো আলমের দ্বন্দ্ব দেখবেন, যা প্রমাণ করে একদিকে ভেরি স্ট্রং লেভেল অফ রেন্ট সিকিং ক্যাপিটালিজম। অন্যদিকে ক্যাপিটালিজমের মধ্যে ডেমোক্রেটিক যেসব বিষয় থাকে তা হবে না। অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম প্রথম দিকে ৩টি বিষয়ের কথা বলছিলেন, সেগুলো হচ্ছে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতি। কিন্তু এখানে রাজনীতিও এসব পারমিট করে না। রাজনীতি শুধুমাত্র রেন্ট সিকিং পুঁজিবাদের ইন্টারেস্ট রক্ষা করতে সক্রিয় আছে। এটা নিওলিবারেলিজমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটা গত শতকের পঞ্চাশের দশকের নিওলিবারেলিজম নয়, এটা বিশ্বায়নের ম্যাট্রিক্সে একুশ শতকের

নিওলিবারেলিজম। এখানে আপনি টমাস পিকেটির $r > g$ পাবেন। উল্টোটা হলে আপনি একটা ক্ল্যাসিকাল বা ভাল পুঁজিবাদ পেতে পারতেন।

আজাদ খান: (অধ্যাপক, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর): আমাদের উৎপাদন পদ্ধতিতে, উৎপাদিকা শক্তির দিক থেকে কৃষকের জমি কমে যাওয়ার ব্যাপারটা খুবই আশঙ্কাজনক এবং নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তিতে কৃষকের প্রবেশগম্যতাও একটা সমস্যা। পাটের মত পুরনো অর্থকরী ফসলে কৃষক আর আগ্রহী হচ্ছে না। সয়াবিন তেলের দাম বাড়লে আমরা হতাশ হয়ে পড়ি, কিন্তু কৃষকের কাছে জমি থাকলে এবং পরিকল্পিতভাবে আমরা তেল বীজ উৎপাদন করতে পারলে, তাহলে হয়তো কৃষকের নিজস্বতা ও শক্তি বৃদ্ধি পেত। এতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষকের সাথে ভোক্তার শ্রেণিগত সম্পর্ক তৈরি হত। তাই এখন প্রচলিত পুঁজিবাদের সংজ্ঞায়ন এবং গ্রামীণ শ্রেণি সম্পর্কটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে তুলে ধরা দরকার। এছাড়া কৃষকের নিঃস্বকরণের বিষয়টাকেও একটা সংজ্ঞার মধ্যে নিয়ে আসা দরকার। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে আমরা জানতে চাই।

মনিরুল ইসলাম খান: উনি একটা বড় ইস্যু রেইজ করেছেন। আমরা দেশের কৃষিতে যে প্রবণতা দেখছি সেটা পুঁজিবাদী প্রবণতা। পুঁজিবাদ নিয়ে বহুদিন বিতর্ক চলছে। অনেকে বলেছিলেন এটা হয়ে গেছে, আবার অনেকে নানা বিতর্ক তুলেছেন। এখন পুঁজিবাদী ট্রেন্ড খুব শক্তিশালী। সমাজবিজ্ঞানে পুঁজিবাদকে আউটলুক দিয়েও দেখা হয়, অর্থাৎ পুঁজিবাদী মনোভাব এসেছে কিনা। আমি বলেছি যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী মনোভাব, অর্থাৎ মানুষ লাভ করতে চায়, এরকম বিষয়গুলো ঢুকে গেছে। এটা পরিমাপ করে কতটা ঘন পুঁজিবাদ, সেটা সূচকের ব্যাপার, সে ধরনের টেকনিক্যাল আলোচনায় আমরা যাইনি, কিন্তু এটাই হচ্ছে প্রবণতা। তবে ডেমোগ্রাফিক পার্থক্য, খামারের আকার ছোট হয়ে যাওয়াসহ কিছু উল্টো প্রবণতাও আছে। কারণ পাঞ্জাবসহ অন্যান্য জায়গায় কনসেনট্রেশন অফ ল্যান্ড দেখা যায়। অর্থাৎ একজনের কাছে অনেক জমি আসতে থাকে, তারপর সে একধরনের লাভজনক উৎপাদনের দিকে যায়। সেই কনসেনট্রেশনটা বাংলাদেশে হচ্ছে না। সুতরাং আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে, এখানকার পুঁজিবাদ অন্য দেশ থেকে একেবারে আলাদা, তবে হয়তো আরও বিশ্লেষণ ও গবেষণা দরকার এটাকে আরও সঠিকভাবে চরিত্রায়ণ করার জন্য।

দ্বিতীয় দিন : ২১ আগস্ট ২০২৩

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক : অর্থনৈতিক পরিসর ও বাস্তবতা

সুরাইয়া বেগম : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় “প্রতিবেশগত ও জেন্ডার ন্যায্যতা ও সুস্থায়ীত্বের লক্ষ্যে রূপান্তরণ” প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব গ্রামে কৃষকদের সাথে একশন রিসার্চমূলক কাজ করছি, সেখানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রেণি সম্পর্কের আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতেও বাংলাদেশে কৃষি কাঠামো, উৎপাদন সম্পর্ক তথা শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়ক তাত্ত্বিক দিক এবং বাস্তবতা বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। আমরা কৃষকদের সাথে যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছি, তার ভিত্তিতে গ্রামগুলোতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদন সম্পর্ক কোন কিছুই স্থির অবস্থায় নেই, পরিবর্তন হচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, আধাসামন্ততান্ত্রিক বা যেভাবেই বলি না কেন, আমাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের এক ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। আমরা মজুরদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি, তারা তাদের প্রতিপক্ষ শ্রেণিকে খুব সহজে এবং স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারছে না। জমির অনুপস্থিত মালিক না কর্পোরেট গোষ্ঠী না রাষ্ট্রীয় নীতিপুস্ত রাজনৈতিক আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী, কারা তাদের প্রতিপক্ষ শ্রেণি, সেটা তাদের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে শ্রেণি সম্পর্কের বিশ্লেষণটা অত্যন্ত জরুরী। সেই প্রেক্ষাপট থেকেই আজ আমাদের চিন্তার আকাশকে প্রসারিত করবেন অধ্যাপক এম এম আকাশ। তাঁর আলোচনার শিরোনাম বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: অর্থনৈতিক পরিসর ও বাস্তবতা।



এম এম আকাশ

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য, রিইব পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: অর্থনৈতিক পরিসর ও বাস্তবতা

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রেণি সম্পর্ক, এটার তাত্ত্বিক এবং বাস্তব দিক। শ্রেণি সম্পর্ক বলতে আসলে আমরা ধারণাগতভাবে কী বুঝি? শ্রেণি সম্পর্ক হচ্ছে Class Relations - যার অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদন সম্পর্ক বা Production relations। তাই অনেক সময় শ্রেণি সম্পর্ক না বলে গভীরভাবে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক। তার মানে হচ্ছে এটিকে যদি আমরা সামাজিক বা আদর্শিক বা অন্য কোনভাবে প্রথমেই চিহ্নিত না করে অর্থনৈতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চাই, তাহলে আমাদের মতে আরও যথাযথ প্রপঞ্চ হবে ‘উৎপাদন সম্পর্ক’। বলাবাহুল্য যে মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা এভাবে দেখলেও সবাই সেভাবে নাও দেখতে পারেন।

অর্থনৈতিক শ্রেণি এবং এসব শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক কি, সেটাই আমার আলোচনার বিষয় হিসেবে আমি ধরে নিচ্ছি। অর্থনৈতিক শ্রেণির মৌলিক বিভাজন হচ্ছে প্রোডাকশন সিস্টেম বা মোড অব প্রোডাকশন বা উৎপাদন পদ্ধতির নিরিখে বিভাজন। কার্ল মার্কসের ভাষায় বললে মোড অব প্রোডাকশন আর সাধারণ অর্থনীতির ভাষায় বললে প্রোডাকশন সিস্টেম বা উৎপাদন পদ্ধতি। এর দুটো দিক থাকে: একটি হচ্ছে উৎপাদিকা শক্তি বা প্রোডাকটিভ ফোর্স; আরেকটা থাকে উৎপাদন সম্পর্ক বা তার ভিত্তিতে হয় শ্রেণি ও শ্রেণি সম্পর্ক। আরও বিস্তারিত আলোচনায় উৎপাদনশক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ভূমি বা সকল প্রাকৃতিক সম্পদ। পানি, বাতাস, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলোও সবই প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি। এখানে ভূমিকে আমরা শুধু জমি বা মাটি হিসেবে উল্লেখ করছি না বরং এখানে ভূমি বলতে উল্লিখিত সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ বোঝাচ্ছি। এইটা কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রধান একটা উৎপাদিকা শক্তি। দ্বিতীয় আরেকটা উৎপাদিকা শক্তি হচ্ছে শ্রম বা লেবার বা মানুষ। এই অর্থে যেগুলো ব্যবহার করে আমি কোন কিছু উৎপাদন করতে পারি সেগুলোই আমার উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এগুলো প্রয়োজন। এই হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ একটা দরকারি উপাদান। কারণ মাটিতে না দাঁড়ালে আপনি কাজ করবেন কিভাবে? অথবা মাটিতেই কাজ করতে হয়, অথবা খনি থেকে জিনিস তুলতে হয়। এছাড়া বাতাস থেকে নিঃস্বাস নিলেন। যেভাবেই হোক তারা উৎপাদনের প্রাকৃতিক পূর্বশর্তগুলি তৈরি করে।

মানুষের মধ্যে শ্রমশক্তি থাকে। উৎপাদন মানেই উৎপাদক, আর উৎপাদক মানেই মানুষ। হাওয়ায় উৎপাদন হয় না বা আমি মনে মনে চাইলেই আম গাছে ফল ধরবে না। এজন্য কাউকে হয়তো মাটিতে বীজ বপন করতে হবে, সেই গাছে আম হবে, তারপর কেউ গাছ থেকে পরিশ্রম করে আম সংগ্রহ করবে ইত্যাদি। সেই হিসেবে শ্রম উৎপাদিকা শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষ তার হাত-পা ব্যবহার করে শ্রম দেয়। তার হাত-পাও যথেষ্ট নয়, এজন্য যন্ত্রপাতি দরকার হয়। সে যন্ত্রপাতি তৈরি করে। যেটাকে আমরা বলি তৈরিকৃত উৎপাদনের উপায় বা প্রডিউসড মিনস অব প্রোডাকশন। এর মালিকরা একে অনেক সময় “পুঁজি” নামে ডাকে। মার্কসবাদীরা নিছক উৎপাদিত উৎপাদনের উপায়কে পুঁজি নাম দেন নি।

বাজার অর্থনীতিতে পুঁজিকে মানুষ যন্ত্র রূপে দেখেন না। তাদের চোখে পুঁজি বলতে বুঝায় মুদ্রা বা অর্থ। বাজার অর্থনীতি বা মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে মুদ্রা বা টাকাপয়সাই হচ্ছে পুঁজি। এইভাবেই আমরা সাধারণত দেখি। মুদ্রা মানে কাগজের টাকা। টাকা মানে এর মাধ্যমে অর্জিত ক্রয় ক্ষমতা। এই ক্রয় ক্ষমতা দিয়ে আপনি শ্রমিক বা জমি ভাড়া নিতে পারেন বা একটা কারখানাও বানাতে পারেন। সুতরাং অর্থরূপী পুঁজির অসীম ক্ষমতা নির্ভর করবে পরিমাণের উপর।

এর অর্থ মার্কসের মৌলিক ধারণা অনুযায়ী আমরা বাজার অর্থনীতিতে প্রাথমিকভাবে তিন ধরনের উৎপাদিকা শক্তি বা প্রোডাক্টিভ ফোর্স পাচ্ছি: ভূমি, শ্রম আর পুঁজি। এগুলো যদি আলাদা থাকে তাহলে উৎপাদন হবে না। অর্থাৎ ভূমি বা ভূমির মালিক, শ্রমশক্তি বা তার মালিক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আলাদা আলাদা থাকলে কৃষি উৎপাদন হবে না। এজন্য লাঙ্গল, জমি, শ্রমশক্তির একটা মিথষ্ক্রিয়া বা সিন্থেসিস লাগবে, একটা সংগঠন লাগবে। যখন সংগঠিতভাবে একটা কিছু উৎপাদন হয়, তখন আমরা চিন্তা করি যে জমির মালিক কে, শ্রমের মালিক কে, যন্ত্রপাতির মালিক কে এবং তখন প্রশ্ন আসে যে মালিকদের মধ্যে সম্পর্কটা কি? এইটা হলো উৎপাদনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য যেখান থেকে নানা ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন সম্পর্ক ও নানান শ্রেণির নানারকম শ্রেণিসম্পর্কের সংজ্ঞা প্রণীত হয়।

এখন আধুনিক যুগে মার্কসের সময়ের পর আমরা আরো দুটি নতুন উদীয়মান গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদিকা শক্তিকে সংযুক্ত করেছি। একটা হচ্ছে আমাদের জ্ঞান আর আরেকটা হচ্ছে, মার্কস যাকে কখনো কখনো বলেছেন মানসিক শ্রমশক্তি যেটা দক্ষ শ্রমিকের থাকে। মানে তিনি শ্রমিকের মধ্যেই জ্ঞানকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন জ্ঞান নিজেই একটি ভিন্ন Autonomous intellectual property হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, তাই শুধু শ্রমিক বললে এটাকে ঠিক বোঝা যাবে না। যেমন, একজন প্রোগ্রামারের জ্ঞান। প্রোগ্রামিং এর জ্ঞান যার মধ্যে আছে, তাকে আমরা মানসিক শ্রমিক বলতে পারি কিন্তু সেটার আধুনিক তাৎপর্য আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না। বর্তমানে জ্ঞানের মালিকানা আছে, পেটেন্ট আছে, মেধাস্বত্ব বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট আছে। আমি হয়তো জ্ঞানের মালিক হতে পারি বা জ্ঞানটা আমার মধ্যে থাকতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞানটার পেটেন্ট

যদি বিল গেটসের কাছে থাকে, তাহলে আমি এই জ্ঞান কোথাও তার অনুমতি ছাড়া বা তাকে প্রিমিয়াম না দিয়ে ব্যবহার করতে পারব না। সুতরাং এই ধরনের জ্ঞানও এখন এক ধরনের উৎপাদিকা শক্তি এবং পৃথিবীতে তার মালিকানাও বহুজাতিক কোম্পানী হিসাবে তৈরি হয়েছে। আর উন্নত কর্পোরেট ক্যাপিটাল ব্যবহার করে সংগঠন চালানোর জন্য এমবিএ পাস ম্যানেজারও তৈরি করা হচ্ছে। এই ম্যানেজাররা হলো আধুনিক সংগঠক এবং তারা নিছক শ্রমিক নাও হতে পারেন, তাদের নিজস্ব শেয়ার মালিকানাও থাকতে পারে। পুরো চক্রটোর বা উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে যেসব মানুষ জড়িত তাদের শ্রেণী পরিচয়, ভূমিকা ও মর্যাদা ও আয়ের অংশ কি দ্বারা প্রধানতঃ নির্ধারিত হয়?

মার্কসের মতে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উৎপাদন শক্তির বিভিন্ন মালিকদের মধ্যে সম্পর্কটা বিচার করলে, আমরা কতগুলো উৎপাদনের ধরন বা পদ্ধতি বা স্টাইল দেখতে পাব? বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র উৎপাদন সম্পর্কও দেখতে পাওয়া যাবে। মার্কস শ্রেণি বিভক্ত সমাজে তিনটা ধরন আবিষ্কার করেছিলেন। মানে যেখানে মালিকানা ব্যবস্থা খুব বৈষম্যমূলক, কেউ অনেক কিছু মালিক, আবার কেউ কোন কিছু মালিক নয়। এই ধরনের সমাজকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। একটা হলো দাস সমাজ। যেখানে দাসরা কোনো কিছুই মালিক নয়। শ্রম, জমি, পুঁজি, জ্ঞান— কোন কিছুই মালিক না। কারণ সেই মানুষটারই তো মালিক অন্যজন। তার নিজের কোনো স্বাধীন মালিকানা নাই। সুতরাং এইটা চরম বৈষম্যমূলক শ্রেণি বিভক্ত সমাজ। স্লেভ মাস্টার বা দাস বনাম দাসের মালিক। সেটাকে আমরা বলছি দাস সমাজ। এটা ছিল একসময় পৃথিবীতে প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি।

এর পরের উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক। এখানে জমি ও কৃষি উৎপাদনই মূল বিষয়, শিল্প উৎপাদন নয়। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন হচ্ছে প্রধান। যারা জমির মালিক, তারাই হলো শাসক শ্রেণি। যারা জমির মালিক নয়, তারা হলো প্রজা। জমির মালিকের মধ্যে আবার স্তরবিন্যাস আছে। একদম নিচে হলো গ্রামের মাতবর, তার ওপরে খাজনা আদায়কারী, এরপর আমলাতন্ত্রের নানা স্তর আছে। আর শেষ স্তরে আছে মোনার্ক বা সম্রাট। এটাকে মার্কস বলেছেন এশিয়াটিক সামন্তবাদ। অনেকে বলেছেন যে

পশ্চিমা সামন্তবাদ হচ্ছে বিকেন্দ্রীকৃত বা ডিসেন্ট্রালাইজড। যেমন ছোট ছোট জমিদার থাকলো, তার উপরে কেউ থাকলো। আবার নাও থাকতে পারে। আর বাংলাদেশে বা প্রাচ্যে বিকেন্দ্রীকৃত বা কেন্দ্রীয় উভয় রকমই হয়। মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে এক ধরনের আমলাতন্ত্র ছিল। তার অধীনে এশিয়াটিক গ্রাম গড়ে উঠে। যেখানে জমির মালিক কোনো জমিদার নয়। জমির মালিক হলো সম্রাট। এরপর ধ্রুপদি সামন্তবাদ, যেটা হচ্ছে বিকেন্দ্রীভূত সামন্তবাদ। রোমান সাম্রাজ্যের ভাঙনের সাথে দাস সমাজও ভেঙে যায়। ইউরোপে যখন নানা ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তৈরি হল, তখন সেখানে সেটা বিকেন্দ্রীকৃত সামন্ততন্ত্র হল। অর্থাৎ জমিদাররা জমির মালিক। বাংলাদেশেও ব্রিটিশদের জমিদারি আইনের মাধ্যমে এশিয়াটিক কেন্দ্রীভূত সামন্তবাদ বিকেন্দ্রীকৃত সামন্তবাদে রূপান্তরিত— যদিও এ নিয়ে নানা বিতর্ক বিদ্যমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন যখন করা হল এবং জমির কর্তৃত্ব অনেকটাই জমিদারের হাতে দিয়ে দেয়া হলো তখন সামন্তবাদের দুটো রূপ— কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রীকৃত দুটোই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দেয়।

পরবর্তীতে সবচেয়ে আধুনিক সমাজকে বলা হয় পুঁজিবাদী সমাজ। এখানে এসে আমরা তিন ধরনের শ্রেণিরই সহাবস্থান দেখলাম। জমিদারের অস্তিত্ব নাই, তবে দাস বা ভূমিদাস শ্রমিকেরও অস্তিত্ব নাই। এটা দাসের চেয়ে ভাল, কারণ দাস তো তার মালিক না। সামন্তবাদের চেয়ে ভাল, বা প্রজার চেয়ে ভাল। কারণ কোন নির্দিষ্ট জমিদারের অধীনে তাকে থাকতে হচ্ছে না, গ্রাম থেকে বাইরে সে যেতে পারছে, একদম স্বাধীনতা নাই— এরকম না। বরং সে একটা বাজার আছে এবং যে কারো কাছে তার শ্রম সে বিক্রি করতে পারবে। দাসের তুলনায় প্রজার স্বাধীনতা বেশি। প্রজার তুলনায় আধুনিক প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারার স্বাধীনতা বেশি। এজন্য বলা হয় Modern proletariat is doubly free. এর মানে কোনো জমিজমাও নাই, বা অন্য কিছুও নাই। আবার বিশেষ কোনো মালিক/স্লেভ মাস্টার বা জমিদারের সাথেও যুক্ত নয়। সে একজন শ্রম বাজারে শ্রম শক্তির বিক্রেতা। বাজারে গেলে সে নিজের শ্রমশক্তিকে বিক্রি করতে পারবে। এক জায়গায় না পারলে আরেক জায়গায় বিক্রি করবে। এক গার্মেন্টস কারখানায় কাজ না পোষালে, আরেক কারখানায় চলে যাবে। কারখানাতেই পোষাচ্ছে না তখন গ্রামে চলে যাচ্ছে। গ্রামে পোষাচ্ছে না, শহরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং

তার চলাচলের বা মোবিলিটির স্বাধীনতা আছে। সেই অর্থে সে একটা মোবাইল। তবে শ্রমশক্তি বিক্রি ছাড়া তার বেঁচে থাকা কঠিন।

এখানে তিনটা বৃহৎ শ্রেণি। প্রতিটি শ্রেণির মধ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষমতার মাত্রাগত তারতম্য আছে : অনেক জমির মালিক, মাঝারি জমির মালিক, কম জমির মালিক, একদম প্রান্তিক চাষী। অর্থাৎ ভূস্বামী বা ভূমিমালিকদের মধ্যেই এখানে পাঁচটা স্তর পাওয়া যায়ঃ একদম নিচে প্রান্তসীমার বাইরে থাকবে ভূমিহীন, তারপর প্রান্তিক চাষী, তারপরে মাঝারি চাষী, তারপরে থাকবে ধনী চাষী। তারপরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জোতদার বা জমিদার থাকবে। তারও উপরে থাকবে শহর থেকে আসা কর্পোরেট খামার মালিক (যেমন, প্রাণ বা কাজি ফার্ম) পুঁজির ক্ষেত্রেও আমরা এটা করতে পারব : কুটির শিল্পের মালিক (সেখানে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছোট তাঁত বা ছোট একটা কুটির শিল্প করে), এখানে পুঁজির পরিমাণ সবচেয়ে কম; তারপর হচ্ছে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ, হয়তো হাজার পঞ্চাশেক টাকার যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করে সে; তারপরে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় উদ্যোক্তা। বড়র পরে হলো একচেটিয়া কারবার। মানে সে তার রাজ্যে আর কোনো পুঁজিপতিকে ঢুকতে দেয় না। ওই বাজারের ওপর তার পুরো নিয়ন্ত্রণ।

এখানে আর্থিক পুঁজির ক্ষমতাটা সবচেয়ে বহুমুখী। পুঁজি যে কোন খাতে যেতে পারে। পুঁজি শিল্প, কৃষি, সেবা- সব জায়গায় কাজ করতে পারে। এমনকি বাংলাদেশে, নেপাল, ইংল্যান্ড বা যে কোন জায়গায় কাজ করতে পারে। পুঁজি লাভ দেখলে মঙ্গল গ্রহেও পুঁজিবাদী বাণিজ্য শুরু করতে পারে।

এর পাশাপাশি আছে জ্ঞান, শ্রম, প্রযুক্তি এবং সংগঠন; এগুলো হচ্ছে পুঁজির কর্তৃত্বাধীন অনুষ্ণং বা পরিপূরক উপাদান। এই দুইটা মেলানোটা একটু গোলমেলে জিনিস। এটা মার্কসের ধ্রুপদি শ্রেণি বিশ্লেষণে সেভাবে আলোচিত হয়নি। তার ধারণা ছিল, পুঁজিবাদের যখন বিকাশ হবে, পুঁজির মালিকরাই উত্তরোত্তর আরো বড় ধনিক গোষ্ঠী হবে। তারা তাদের পুঁজির জোরে জ্ঞান, জমি, শ্রমিক কিনে নিতে পারবে। সুতরাং সমাজে একদিকে পুঁজিপতি নিয়োগকর্তা, অন্যদিকে শ্রমশক্তি বিক্রেতা হিসাবে দুই বৃহৎ শ্রেণি তৈরী হবে। এমনকি যে দক্ষ শ্রম বিক্রি করবে তখন সে বেতনভুক্ত শ্রমিক হবে। গড়ে উঠবে বেতনভোগী মধ্যবিত্ত ও বিশাল শ্রমিকদের ঐক্য- তৈরী

হবে বিপ্লবের পূর্বশর্ত। মার্কসের ধারণা ছিল যে, সমাজে মেরুকরণ হয়ে মজুরশ্রম ও পুঁজিপতিদের দুইটা দল হবে। একটা দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ হবে, কারণ ৮০-৯০% সর্বহারা আর ১০% ধনী মানুষের সমাজ তো টিকতে পারে না, ফলে শ্রেণি সংগ্রাম, আন্দোলন ইত্যাদি হবে।

যাই হোক, এখন বাংলাদেশের আধুনিক অবস্থা যদি আমরা এই আলোকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো, শ্রেণি সম্পর্কগুলো আর অত দ্বিভাজিত-দ্বিমেরুত্ব সরলাকারে নাই। নানারকম জটিলতা ও হেটেরোজেনাস ক্যাটাগরি তৈরি হয়ে গেছে। যেমন আমি একটা সহজ উদাহরণ দেই। একজন লোকের কথা ধরুন, যে গ্রামে নিড়ানির কাজ করে অথবা ফসল কাটার মৌসুমে ধান কাটে। তাকে আমরা তখন কৃষি শ্রমিক বলি। ধরা যাক তার কোনো জমি নাই, কোনো জ্ঞানবুদ্ধিও নাই, ঘরবাড়িও নাই। সে সবচেয়ে নিম্নস্তরের সর্বহারার মধ্যে পড়বে। এখন সে কি করবে? তার উপরে ওঠার কোনো রাস্তা আছে কি? আছে, এখন আছে। সেটা কী? নিয়োগকর্তা নির্বাচন করতে হবে তাকে। যখন পিক সিজন হয়, তখন গ্রামে কৃষি শ্রমিকের চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি থাকে। তখন তারা নিয়োগকর্তা বাছাই করার একটি সুযোগ পায়। তখন সে বাইরে যেখানে শ্রমের চাহিদা বেশী সেখানে চলে যেতে পারে। সেখানে সে সাময়িকভাবে ৫০০/১০০০ টাকা এরকম কিছু একটা পায়। ওখান থেকে তখন সে আবার কিছু পুঁজি জমাতে পারে। যদি পর্যাপ্ত সঞ্চয় হয়, তখন সে আবার সে বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি দিয়ে তার শ্রম আরও উচ্চ দরে বিক্রি করতে পারে। এইটা তার মবিলিটির একটা পথ। আবার বাংলাদেশের মধ্যেই মৌসুমী অভিবাসন হলো তার আরেকটা সুযোগ। যেমন, ঈদের সময় তার গ্রামে কাজ নাই তখন সে ঢাকায় এসে রিক্সা চালাবে। উত্তরবঙ্গে খরাপ্রবণ বা এক ফসলি এলাকা বা সাতক্ষীরার লবণাক্ত এলাকা, যেখানে আর কোনো ফসল হচ্ছে না এবং শ্রমিকের চাহিদা নাই, সেখান থেকে সে খুলনা, সিলেট বা কুমিল্লা শহরে চলে যেতে পারবে। সে হচ্ছে সর্বহারা কিন্তু সে আর হতদরিদ্র নাও থাকতে পারে। বর্তমান বাংলাদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটলে হতদরিদ্ররা কিছুটা উপরে উঠতে পারবেন, তবে তাদের তুলনায় পুঁজির মালিকদের মবিলিটি হবে শতগুণ বেশী।

কৃষিও এক ধরনের পুঁজিবাদ। এখানেও একরকমের বিনিয়োগ হয় এবং এটা নিয়ে বাংলাদেশে বহু মানুষ বহুদিন ধরে তর্ক করেছে। সেটা হলো

গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থাটা কী পুঁজিবাদী নাকি সামন্ততান্ত্রিক? শেষ পর্যন্ত তর্কাতর্কি করে সবচেয়ে সহজ সমাধানে চলে আসছে। সেটা হলো আধা-সামন্তবাদ ও আধা-পুঁজিবাদ। সুতরাং যে পুঁজিবাদ মনে করে, সে আধা-পুঁজিবাদ নিয়েই আছে। আর যে সামন্তবাদ মনে করে, সে আধা-সামন্তবাদ নিয়েই আছে। অনেকটা একজন বলছেন "গ্লাসটা অর্ধেক খালি", আরেকজন বলছেন "গ্লাসটা অর্ধেক ভর্তি"। এটা এইভাবে বলার কারণটা হলো সম্ভবতঃ কারো কারো বিচারে বর্গা সিস্টেমটা ঠিক পুঁজিবাদী নয়। কারণ যে চাষ করছে সে জমির মালিক না, কিন্তু বর্গা সিস্টেমটাই ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম হয়ে যেতে পারে যদি এটা বিপরীত হয়। অর্থাৎ ছোট কৃষক যদি কোনো কৃষি ব্যবসার অধীনে বর্গা প্রতিষ্ঠা করে। যেমন, মিনা বাজারের শহরের মালিক এর অলস পুঁজি আছে এবং সে ঠিক করলো যে, শহরে পুঁজি বিনিয়োগ করবেন না, গ্রামে করবেন। তখন সে কী করলো? প্রথমে কিছু চুক্তিচাষী নিয়োগ করে বললো যে, আমাকে নিয়মিত আমার দোকানের জন্য এই জিনিসগুলো নিয়ে আসবে। আনতে আনতে তারপর সে ঠিক করলো, আমি একজন ম্যানেজার দিয়ে ওই চুক্তিচাষীদেরকে আমার অধীনে আনব। প্রথমে দাদন দিব। তারপর ওরা যখন সেটা শোধ করতে পারবে না, তখন বলবো জমিটা ছেড়ে দাও আমাকে। জমিটা নিয়ে নিল সে। মানে সে পুঁজির মাধ্যমে জমির মালিক হলো। তারপর সে চিন্তা করলো, এই জমি তো আমি চাষ করবো না। চাষ করবে যারা, তাদেরকে আমার আনতে হবে। দুই পদ্ধতিতে আনা যায়— একটা হতে পারে আমি লিজ করে দিতে পারি। কারণ কারখানার উৎপাদন দেখাশোনা করা যতটা সোজা, কৃষি উৎপাদনের সুপারভাইজ করা ততটা সোজা না। যেহেতু সেটা জৈবিক উৎপাদনের বিষয়, সুতরাং এখানে যত্ন এবং নিবিড় পরিচর্যা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যত্ন এবং নিবিড় পরিচর্যা করতে হবে। যাকে আমি শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করবো, তার একটা নিবেদন বা কমিটমেন্ট সেই শ্রমে থাকতে হবে। সেই হিসেবে কারখানায় তো শ্রমিকের এতো নিবেদন বা কমিটমেন্টের দরকার নাই। ওখানে হয়তো বোতাম টেপায় অথবা সেলাই করায় এবং আট ঘন্টা কাজ করে বাড়ি চলে যায়। আবার আসে, কাজ করে। কৃষিকাজ তো তা না। ওখানে রাতের বেলা বৃষ্টি পড়লে আবার দৌড়াতে হবে। সকালবেলা কোনো সময় রোদ বেশি হলে আবার দৌড়ানো। সুতরাং এই ধরনের শ্রমিক তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং

পুঁজিবাদী চিরায়ত শ্রমিক সম্পর্ক বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমে বিশেষ সময়ে থাকে। যেমন ধান কাটার মধ্যে থাকে। কারণ এটা হোমোজিনিয়াস কাজ। তাও সেটাতেও ব্যবস্থাপনার ঝামেলার জন্য একটা সিস্টেম দাঁড়িয়ে গেছে যে, একবিঘা ধান কেটে দিবা, এত টাকা পাবা। পিস রেট!

আমরা মার্কসের কাঠামোতে শ্রেণি সম্পর্ক, এর তাত্ত্বিক দিক এবং বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনারা জানেন যে, মার্কসের কাঠামোতে মোড অব প্রোডাকশন বা উৎপাদন পদ্ধতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিয়ে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একাধিক বিতর্ক ছিল। প্রথম যেই বিতর্কটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের উৎপাদনব্যবস্থা কিরকম? সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ, এই দুটি শিবিরের মধ্যে তখন আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ চলছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অধীনে পশ্চিমের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর একটা শিবির। তারমধ্যে ব্যতিক্রম হলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো। তখন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মোটামুটি একই, এর সাথে আছে ন্যাটোর অধিনস্ত জি-৭ দেশগুলো। আর উল্টোদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক বলয়ের মধ্যে ছিল। এরপর ১৯৯০ সালের দিকে সমাজতান্ত্রিক বলয়ের বিপর্যয়টা হয়। কিন্তু এর আগে সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বের সময়, বামপন্থীদের একটা ধারণা ছিল যে সারাদেশে মুক্তিসংগ্রাম চলছে, লড়াই চলছে পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে, সমাজতন্ত্র বেঁচে থাকবে। ওই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় এবং সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে, তখন প্রশ্নটা ছিল যে উৎপাদন ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন করলে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোনো যাবে। সুতরাং তখন মার্কস, এঙ্গেলসের বইপত্র পড়া হলো। পড়তে গিয়ে দেখা গেলো, মার্কসের মডেলটা বাংলাদেশে খাটছে না। খাটছে না এজন্য যে মার্কসের মডেলটা হলো উন্নত পুঁজিবাদী দেশের মত। ব্রিটেনকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে উনি ক্যাপিটাল বই লিখেছেন। সুতরাং সেখানে তার অনুমান ছিল যে পুঁজিবাদ বিকশিত হতে হতে, যখন সম্পদ ও আয় একদিকে চলে যাবে, আর অন্যদিকে খালি শ্রমশক্তি থাকবে, তখন সেখানে বিপ্লব বা ভোট, ভোটের বিষয়টা ব্যতিক্রম তবে অসম্ভব নয়, তবে প্রধানত বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রটা কয়েম হবে। কিন্তু আমরা তো সেই উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই হতে পারিনি। কারণ আমরা যখন পুঁজিবাদের রূপান্তর করতে যাব তখন

আমরা কলোনী বা উপনিবেশ হয়ে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ ব্রিটেনের কলোনী থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে পাকিস্তানের সেমি কলোনী ও অবশেষে আমেরিকার নিওকলোনী হয়ে যাওয়াতে আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এজেন্ডায় থাকতে পারিনি। তারা যেই আশু এজেন্ডাটা গ্রহণ করে, সেটা হলো জাতীয় মুক্তির আন্দোলন।

তখন এশিয়ার এক এক দেশে এক এক রকম বহুগাঠনিক উৎপাদন পদ্ধতি বিরাজ করছে। আফ্রিকারও এক এক দেশে এক এক রকম। বাংলাদেশেও তার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই কারণেই তখন মার্ক্সিস্ট প্রেক্ষিত থেকে একটা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মোড অব প্রোডাকশনটা কী, সেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মতভেদ হয়ে যায়। কেউ কেউ বলে যে বাংলাদেশ হচ্ছে আধাসামন্ততান্ত্রিক অর্থাৎ গুরুত্ব দেয় কৃষিতে। এখানে আধা-সামন্তবাদের বর্গা পদ্ধতি বিরাজমান। বর্গাদার জমিদার তার জমিতে চাষ করছে অথবা সেটা বর্গা দিয়ে দিচ্ছে। ওই চাষিরা হলো তাদের প্রজা। তারা যখন বর্গা দিচ্ছে তখন তারা জমিটাকে ছোট ছোট ভাগ করে দিচ্ছে। যাতে ওই পরিবার বেঁচে থাকার জন্য সর্বোচ্চ পরিশ্রম করে এবং ওখানে সর্বোচ্চ উৎপাদন করা যায়। এছাড়া যেন সেখান থেকে সর্বোচ্চ ভাড়া সংগ্রহ করা যায়। ওটাকে খাজনা বলা যায় না। বলা হতো দুইভাগ আমরা নিব, একভাগ তোমার। কিন্তু অতীতে যে তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল, সেই কারণে বাংলাদেশে শেষ পর্যন্ত বর্গার ভাগাভাগিটা ছিল অর্ধেক-অর্ধেক। এখানে উৎপাদনে পুঁজি এবং শ্রম সবই বর্গাচাষী দেয়, তাহলে তিনভাগের দুইভাগ তাকেই দিতে হয়, নাহলে তো তার পোষায় না। এইসব নিয়ে তর্ক চলছিল তখন বলা হলো যে, জমির একটা বড় অংশ, প্রায় তিনভাগের একভাগ জমি বা একটু বেশি জমি এই বর্গা খাতে আছে, সুতরাং এটাকে আর পুঁজিবাদী কৃষি বলা যায় না। এটাকে বরং বলা যাবে ক্ষুদ্র জমির মালিকভিত্তিক চাষ বা ফ্যামিলি ফার্মিং সিস্টেম। আর পুঁজিবাদ যদি থাকেও, সেটা ছিল ক্ষুদ্র খামারে এবং ধনী চাষীদের অধীনে। অন্যদিকে আমরা ইংল্যান্ড বা যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল পুঁজিবাদী খামার দেখি। যেখানে উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে কীটনাশক ছিটানো হয় এবং যেখানে পুরো যান্ত্রিক ট্রাক্টর দিয়ে বিশাল একখণ্ড জমি চাষ করা হয়। কিংবা বাণিজ্যিক কৃষিজ খামারে পুঁজিবাদী শ্রমিক দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কিছুটা ব্যতিক্রম, সেখানে প্রথমদিকে খামারগুলো কিছুটা পুঁজিবাদী আর কিছুটা দাসভিত্তিক

বাগান বা প্লান্টেশন ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে তো এগুলোর কিছুই নাই। এখানে প্লান্টেশন বা বিশাল পরিসরের অর্থনীতি নাই, শুধু চা বাগান আছে। সুতরাং আমাদেরকে আধাসামন্ততান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক বলারও সুযোগ নাই। এটা স্মল কমিউনিটি প্রোডাকশন। ছোট চাষি উৎপাদন করছে, নিজের জন্য কিছু রাখছে, কিছুটা খাজনা হিসেবে দিয়ে দিচ্ছে, বাকিটা বাজারে বিক্রি করে টাকা-পয়সা উপার্জন করছে। সে যে আরও জমি কিনে বা আরও জমি ভাড়া নিয়ে একটা পুঁজিবাদী উৎপাদন করছে তা কিন্তু নয়। তার নুন আনতে পাস্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা। মানে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং প্রান্তিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এতে অনেক কৃষক জমি হারিয়ে পেছনে পড়ে যাচ্ছে এবং যখন অনেকে জমি হারিয়ে পেছনে পড়ে যাচ্ছে, তখন বর্গা জমিরও সংকট হচ্ছে, জমি পাচ্ছে না। তখন তারা কৃষি থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার কারণে এটাকে আধাসামন্ততান্ত্রিক না বলে আখলাকুর রহমান প্রথম বললেন এটা একটা পুঁজিবাদী পদ্ধতি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ এটার প্রেক্ষিতে বললো যে, এখানে ভূমিহীন এবং ভূমিহীন হতে চলেছে এমন লোকদের সঙ্গে শহরের শ্রমিকদের নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে। কৃষিতে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের বিপ্লব। শহরে শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিপ্লব।

সে সময়কার আরেকটি সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ১৯৮০-র দশকে ক্ষেতমজুরদের সংগঠন তৈরি করলো। ক্ষেতমজুর সমিতি তৈরি করে তারা খাস জমি দখল করা শুরু করে। কারণ ছোট কৃষকের জমি দখল করে তো আর লাভ নেই। ছোট চাষীদের জমিকে জাতীয়করণ করার প্রশ্নও তখন অবাস্তব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একশ বিঘা সিলিং ধরে উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বন্টন করার একটা নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সংসদে যোগ দেওয়ার পর উত্তরবঙ্গের একশ বিঘার অধিক জমির মালিক আওয়ামী লীগের এমপিরা তার কাছে জমির মালিকের সংজ্ঞা জানতে চায়। তখন তিনি বলেন যে, ঠিক আছে, জমির মালিকের পরিবারে যদি তিনটা সন্তান থাকে, তবে তিন সন্তানকে পৃথক পরিবার ধরে প্রত্যেকের একশ বিঘা হিসাবে তিনশো বিঘা আর পরিবার প্রধানের একশ বিঘা মিলিয়ে মোট চারশো বিঘা হলো সিলিং। কিন্তু চারশো বিঘা সিলিং হলে তো আর কোনো জমি পাওয়া যায় না। সুতরাং ভূমি

সংস্কারের যে একটা সম্ভাবনা স্বাধীনতার পর ছিল, সেটা পূর্ণ হলো না। পুঁজিবাদ বিকাশকে ঠেকানোও সম্ভব হলো না। যাদের বেশি জমি ছিল, তাদের সম্ভানদের মধ্যে সেই জমি ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার কারণে, ডেমোগ্রাফিকভাবে ছোট জমির মালিকের প্রসার ঘটতে থাকলো। এর মধ্যে যেসব সম্ভান লেখাপড়া শিখলো, তারা বুঝলো যে, এই অল্প জমির উপর নির্ভর করে তাদের প্রাচুর্য আসবে না। সুতরাং তারা এই খামার ছেড়ে চলে গেলো। সব মিলিয়ে গ্রামে Pauperization বা নিঃস্বকরণ হলো কিন্তু capitalist polarization হলো না।

এখন বাংলাদেশে জমিকে কেন্দ্র করে খালি মেহনতি মানুষই আছে। কৃষি কাজটা এখন মেহনতি মানুষের কাজ হয়ে গেছে। বাপ-দাদার আমল থেকে এই মেহনতি মানুষদের যে পরিমাণ জমি ছিল, সেগুলো হারাতে হারাতে একদম শূন্য জমির মালিক হয়ে গেলো বা অল্প একটু ভিটেমাটি বা একটু কিচেন গার্ডেন অবশিষ্ট থাকলো। কিন্তু উল্টোদিকে আরেকটা জিনিস হয়েছে যে, উৎপাদনশীলতা অনেক বেড়ে গেছে। আগে বছরে একটা ফসল হতো। এখন জলসেচ এসেছে, আর এটার সাথে বায়োকেমিক্যাল ইনপুটস বা কৃষি উপকরণ এসেছে। ফলে এখন জমিতে ফসল বেশি হচ্ছে। আমরা বলি যে স্বাধীনতার পর জমি কমেছে, কিন্তু তিনগুণ ফসল হওয়ার কারণে আমরা খাদ্যসংকট এড়াতে পারছি। অর্থাৎ শ্রম নিবিড় বায়োকেমিক্যাল পদ্ধতিতে যেসব জমি চাষ করা হতো, তার উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল। এক্ষেত্রে দুইটি দিক মনে রাখতে হবে। এখানে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে সার-কীটনাশক টাকা দিয়ে কেনা হয়। এজন্য ফসল বিক্রি করে টাকা আয় করতে হয়। তার মানে ক্ষুদ্র কৃষকরা আগে জমিতে অল্পস্বল্প সেচ দিয়ে যে নিজের মত ফসল ফলাতো সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন পুরোপুরি বাণিজ্যিক। এমনকি আগে জমিদারদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে জমি ভাড়া নিতে হতো না। ফসল কাটার সময় অর্ধেক ফসল জমির মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হত। তার মানে আগে খাজনাটা ছিল ফসলে, এখন খাজনাটা ক্যাশ টাকায়। অর্থাৎ টাকা আগে দিতে হয়, চুক্তি হয়, তারপরে জমি চাষ। সুতরাং আমরা ১৯৮০ এর দশকের যে পুঁজিবাদী বিকাশ বা বাজার অর্থনীতির কথা বলছিলাম, সেটা আস্তে আস্তে বাড়ছে।

গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা একটা এখন সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। গ্রামে শ্রমিকের সংকট হচ্ছে। যখনই শ্রমিকের সংকট হয়, তখনই সেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার

হয়। তার মানে এখন ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি ব্যবহার শুরু হবে, যেটাকে যান্ত্রিকীকরণ বলে। এতে যেসব শ্রমিকরা কাজ হারাবে, তারা যদি শহরে কারখানায় কাজ না পায়, তাহলে একটা অপ্রতিষ্ঠানিক বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত গ্রামেই তৈরি হতে হবে। এটা শহরে বা গ্রামে উভয় জায়গায় হবে। এভাবে ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী পারিবারিক শ্রমের এবং খণ্ডকালীন শ্রমিকের একটা উৎপাদন সম্পর্ক তৈরি হবে। এছাড়া এই ধরনের অসংখ্য ছোটখাটো কার্যক্রম থাকবে। কিন্তু এটা তো স্পঞ্জের টুকরার মত। স্পঞ্জের টুকরা পানিপূর্ণ হয়ে গেলে আর অতিরিক্ত পানি শোষণ করতে পারে না। তাই গ্রামের উদ্ধৃত শ্রম অনুন্নত-অপ্রতিষ্ঠানিক-অকৃষি খাতে সরবরাহ করা হয়, আবার কখনো কৃষিতে দেওয়া হয় এবং তা নির্ভর করে অপ্রতিষ্ঠানিক খাতের শ্রম ধারণ ক্ষমতার উপর।

কিন্তু সার্বিকভাবে শ্রমিকরা গ্রামে অন্ততঃ যথাযথ ধরনের কাজ পাবে না। কারণ যখন সেখানে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা জিরো হয়ে যাবে তখন ওই শ্রমিককে তারা আর নিয়োগ দিবে না, তাকে ঠেলে দিবে শহরে। শহরে শিল্পোন্নয়ন হলে গ্রামের দরিদ্র শহরে চলে আসবে এবং শহরেও বস্তি এলাকা তৈরি হবে। বাংলাদেশে এই কারণে এটাকে পুঁজিবাদ বা সামন্তবাদ না বলে, যেই ক্যাটাগরিটা আমি বলতে পছন্দ করি সেটা হচ্ছে মাল্টিস্ট্রাকচারাল প্রডাকশন বা বহুকাঠামোভিত্তিক উৎপাদন। এর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অল্প আয়। এতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়, পুঁজির অভাব থাকে, পারিবারিক শ্রম জড়িত আছে, আবার বাড়তি নিয়োগকৃত শ্রমিকও আছে। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে তাকে ওই ছোট জমির ধানও দ্রুত কাটতে হয়। সেটা একা কাটা যায় না এবং অন্যের সাহায্য লাগে। আবার সে অন্যের জমির ধানও কাটে। এটাকে ঐচ্ছিক শ্রমিক বললে ভুল হবে। আবার এটাকে পুঁজিবাদী শ্রম বা সমষ্টিবদ্ধ পুঁজিবাদী শ্রম বা বৃহদায়তন মজুরীশ্রম বললেও ভুল হবে। কারণ এখানে তো কেউ কেউ মজুরিই দেয় না। সাধারণত এটা ছোট চাষীদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা। আবার যেসব এলাকায় পুঁজিবাদী কৃষকরা আছে, বা যেখানে বাজার নির্ভর কৃষক বা আরেকটু বড় জমির মালিক কৃষকরা আছে, সেখানে কিন্তু শ্রমিকের প্রয়োজন হবেই। এই শ্রম টাকা দিয়ে নিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে চুক্তিটা, কারখানায় যেরকম শ্রমিকরা দলবঁধে যায় এবং কাজ করে চলে আসে ওরকম না, এইটা মৌসুমী। একটা বিশেষ সময়ে প্রয়োজন হয়। এরা বাইরে থেকে

আসা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক। এসব শ্রমিকরা আগে একটা দরাদরি করে: তিনদিনে এইটুকু জমির ধান কেটে দেওয়া হবে, তার বদলে নির্দিষ্ট টাকা দিতে হবে। শ্রমিকরা চেষ্টা করে যত দ্রুত সম্ভব সকলে মিলে ধান কাটা শেষ করতে। এটা পিস রেট। এসব কারণে আমরা বলব যে এইটা আরেকটা অস্থায়ী পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক।

এখন শহর থেকে পুঁজি নিয়ে চুক্তি-খামার খোলা হচ্ছে। তারপরে সেটা আধুনিক খামারে রূপান্তরিত হচ্ছে। কৃষি এখন আরও বহুমুখী হয়েছে। সেখানে আবার ফসলের পাশাপাশি মৎস্য, গবাদিপশু, পোল্ট্রিও আছে। গ্রামে এসব পোল্ট্রি, ফিশারি, লাইভস্টক খামারগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের (এসএমই) মধ্যে আরেকটা কাঠামো। এখন গ্রামের শ্রমশক্তির কাজটা বহুমুখী, কখনো সে হয়তো লাইভস্টকে গিয়ে কাজ করছে, কখনো ফিশারিতে গিয়ে কাজ করছে, কখনো পোল্ট্রিতে গিয়ে কাজ করছে, কখনো নিজের জমিতে কাজ করছে, কখনো অন্যের জমিতে কাজ করছে। কখনো আবার কোনো আধুনিক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে নারীরা আগে গৃহস্থালি কাজে বেশি নিয়োজিত থাকতো। এখন যেভাবেই হোক তাদের বাইরে আসার একটা সুযোগ আছে। বিশেষ করে তারা গার্মেন্টস খাতে ঢুকছে। ছেলেরা যেমন দেশের বাইরে প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে চলে যাচ্ছে, তেমনি মেয়েরাও শহরে শিল্প শ্রমিক হিসেবে চলে আসছে। মেয়েরা আগে যতটুকু পেতো, অন্য কোথাও তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি পেলে চলে যাচ্ছে। আধুনিক সমাজে একটা মেয়ের ঘর থেকে বের হওয়া এক ধরনের সামাজিক অগ্রগতি।

কিন্তু শোষণের দিক থেকে কিন্তু এই অগ্রগতির যুক্তি ধোঁপে টিকবে না। কারণ নারীরা আগে ঘরের কাজ করে কৃষিকাজ করতো। এখন এখানে এর চেয়ে যে সে ভাল আছে, তাও নয়। তাদের যে জীবনযাপন, রাত তিনটায় উঠে নিজের রান্না করতে হচ্ছে, কারণ এরপরে গ্যাস থাকবে না। সে রান্না করে তারপর কারখানায় যাবে। গিয়ে ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ওভারটাইম করবে। টাকা যেটা পাবে সেটা পুরোটা নিজের কাজে লাগাতে পারবে না। তাকে অর্ধেক টাকা বাবা-মাকে দিতে হয়। এখন তো মোবাইলের মাধ্যমে বা বিকাশে পেমেন্ট হয়। কিন্তু এমনও শুনেছি নারীরা তার নিজের একাউন্টের পিন নাম্বারও জানে না, এটা তার স্বামীর কাছে থাকে। সুতরাং

টাকাটা তার স্বামী নিয়ে নিতে পারে। এটা হলো পিতৃতান্ত্রিক শোষণের পাশাপাশি সস্তা শ্রমের পুঁজিবাদী শোষণ। দুটো শোষণের শিকার হয় সে।

আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্পোন্নয়ন কিছুটা আনুষ্ঠানিক সেবা খাতে, আর কিছুটা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে হয়েছে। সেটা এখন জিডিপি-র ৩৩ ভাগ। আগে হয়তো ২০-২৫ ভাগ ছিল। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। এতটা হয়নি যাতে উদ্ভূত শ্রমকে এখানে এনে পুরো দেশের আধুনিকায়ন করা যাবে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে শ্রমের মবিলিটি বা চলাচল এখন অনেক বেড়েছে। তার মানে সামগ্রিকভাবে যেহেতু আমি অনেকগুলো কাঠামোর কথা বললাম, এগুলোকে কোন একক নাম আমি দিব না। তাহলে আমি ক্রান্তিকালীন বা ট্রানজিশনাল মডেলগুলোর বৈচিত্র্য মিস করবো।

এই কাঠামোর বর্ণনা হলো একটা দিক। আরেকটা দিক হলো এক্ষেত্রে কে বিজয়ী হবে সেটা বোঝা। শেষ পর্যন্ত কী হবে? কে এখানে শাসক শ্রেণি হবে? কোন কাঠামোটা এখানে সমগ্র সমাজের বিকাশকে প্রভাবিত করবে? বর্তমানে মোটামুটি কাদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি ও উৎপাদনশক্তি আছে? আধুনিক প্রযুক্তি আমদানিও করা হচ্ছে, কারা তা করছে? কাদের কাছে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়ার মত পুঁজি বা সঞ্চয় আছে এবং কারা দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়? সবাই বলবেন তারা হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই অর্থনীতির মূল কাঠামোটা হবে পুঁজিবাদ। তবে এখানে একটা বড় সংশোধনী আছে। সেটা হলো আমরা বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা অংশ। আমাদের অবস্থান বৈশ্বিক পুঁজিবাদের প্রান্তে। এখন প্রান্তের চ্যালেঞ্জটা কী? এখানে বলা হয় আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হবো। একেবারে প্রান্ত থেকে দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, মালয়েশিয়া এই ধরনের দেশ আমরা হতে পারব কি না? সেটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ। এরকম হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। ইন্ডিয়ার মতো হতে হলে একটা জাতীয় ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া দল লাগবে, একটা জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি লাগবে। সেইটা আমাদের এখানে হয়নি। আমাদের এখানে স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক পথ নেওয়াতে তখন পুঁজিপতি শ্রেণি তৈরি হয়নি। পাকিস্তান আমলের বাঙালি পুঁজিপতি যারা পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি দ্বারা নির্যাতিত ছিল, স্বাধীনতার পর তারা আবার বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তাদেরকে আমরা ধরে ফেলেছি, কন্ট্রোল করে ফেলেছি। পাটকল, বস্ত্রকল, চামড়া এবং

ফার্মাসিউটিকালস- এই কয়েকটা জায়গায় কিছু জাতীয় ও বিদেশী পুঁজিপতি ছিল। বিদেশীরা তো চলে গেছে। শেখ মুজিবুর রহমান গ্যাসটাও জাতীয়করণ করে ফেলেছিলেন। চা-বাগানগুলো জাতীয়করণ হয়নি, এছাড়া পাটকল, বস্ত্রকল এগুলো হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে ঐ পুঁজিপতি শ্রেণি পিছু হটেছে। এরপর তারা আমদানি-রপ্তানিতে চলে গেছে বা মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে গেছে। আরেকটা সমস্যা ছিল জাতীয় খাতের ব্যবস্থাপনাগত দুর্নীতি। এখানে দুর্নীতি করে পুরো জাতীয় খাতকেই বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান ভেবেছিলেন যারা এগুলোর প্রাক্তন মালিক, তারাই এটা চালাক। কিন্তু আপনি প্রাক্তন মালিকের কাছ থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়েছেন, আবার তাকে দিবেন চালাতে, এইভাবে তো আর চললো না। যেভাবে ভূমি সংস্কার বাতিল হয়ে গেছে, সেভাবে জাতীয়করণও বাতিল হয়ে গেল। যাইহোক একটা সুপ্ত পুঁজিপতি শ্রেণি ছিল, যারা পাকিস্তান আমলে শোষিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পর ধাক্কা খেয়ে আরো নিচে নেমেছিল, পরবর্তীতে পচাত্তরের পর উপরে উঠার সুযোগ পায়। এই কাজটা আস্তে আস্তে জিয়ার আমলে শুরু হল এবং এরশাদের আমলে সেটা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। এইভাবে শহরে যে পুঁজিপতি শ্রেণি তৈরি হল, তারা কিন্তু ফ্রম বটম থ্রু প্রডাক্টিভ সঞ্চয় দ্বারা ধ্রুপদী পুঁজিবাদী কায়দায় তৈরি হলো না। বলা যায় রাষ্ট্রীয় সার্বসিডি ও স্পুন ফীডিং এর মাধ্যমে তারা তৈরী হলেন। ব্যতিক্রম আছে। এক্ষেত্রে আকিজ বিড়িকে উদাহরণ হিসাবে আনতে পারেন। তিনি শুরু করেছেন একটা পাটের ব্যবসা দিয়ে, তারপর নানা কিছু করেছেন। যেই গল্পটা ড. ইউনুস বলার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে আমি ডিম কিনেছি, সেখান থেকে মুরগীর বাচ্চা, মুরগী থেকে ছাগল, ছাগল থেকে আবার গরু, গরু থেকে ফার্ম করে আমি পুঁজিপতি হয়ে গিয়েছি। এটা একটা গল্প, আবার এটা প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদেরও প্রাথমিক পর্বের প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্য। বাজারে সবাই প্রতিযোগিতা করবে। যে সবচেয়ে কম দামে সবচেয়ে দক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করতে পারবে, সে উন্নতি করবে। এ ধরনের উৎপাদনশীল পুঁজিবাদ কি হবে নাকি লুঠপাটের পুঁজিবাদই মুখ্য হবে?

এখানে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ এবং সেই ঋণ ফেরত না দেওয়ার মাধ্যমে বড় পুঁজি হয়েছে। বেসরকারিকরণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান ফেরত পাওয়া, বাজার সিডিকেট করে রাতারাতি মুনাফা অর্জন, আমদানি-রপ্তানি এবং ইনভেস্টিং করে বড় পুঁজি হয়েছে। তার ফলে যে শ্রেণিটার হাতে টাকা জমা

হয়েছে, তারা হচ্ছে অনেকেই লুম্পেন বুর্জোয়া, উদীয়মান পুঁজিপতি এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে তাদের ছোট বলয়। এই বলয়ের দুইটি অংশ: একটা দেশে আর একটা বাইরে। এই বলয়ের মাধ্যমেই বেগমপাড়া চালু হয়েছে। বেগমপাড়া মানে হচ্ছে, আমার বেগমরা থাকবে বিদেশে, আমি থাকব দেশে। এখন এইটা অফিসিয়ালি স্বীকৃত, কারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই কয়েকটা গ্রুপের নাম বলেছেন। তার মধ্যে প্রথম গ্রুপ হলো, অসৎ আমলা; দ্বিতীয় গ্রুপ হলো অসৎ ব্যবসায়ী; আর তৃতীয় গ্রুপ হলো অসৎ রাজনীতিবিদ। এরা ঠিক উদ্যোক্তা না। এরা হলো মানি মেকার। এর ফলে গণতন্ত্রও হচ্ছে না। পুরো সিস্টেমটাকে তাই আমরা বলবো এটা উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা পোস্ট-কলোনিয়াল স্টেট। এখানে আমলারা অধিক ক্ষমতাবান। লুঠেরা পুঁজিপতির আঁচেরে অধিক ক্ষমতাবান। ল্যাটিন আমেরিকার স্কারাররা এটাকে বলেন পেরিফেরাল ক্যাপিটালিজম। আবার বামপন্থী সোভিয়েত স্কারাররা এটাকে বলেন নব্য-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বা নিও-কলোনিয়ালিজম। আবার এখন আরেকটা জিনিস বলা হয় যে, এটা নব্য-উদারতাবাদ বা নিও-লিবারেলিজম। নিও-লিবারেলিজমের ধর্মই হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাবে। আবার ওয়াশিংটন মাহমুদ এটাকে বলেন ক্রনিক ক্যাপিটালিজম।

বাংলাদেশে প্রধান দ্বন্দ্বটা হচ্ছে ৯০ ভাগ মানুষের অবস্থান নিচে। বাকী ১০ ভাগের মধ্যে ৯ ভাগের অবস্থান মাঝখানে, আর ১ ভাগ হলো শাসক শ্রেণি। শাসক শ্রেণী একটা ত্রিভুজ বা ট্রায়াঙ্গেল। একদিকে অসৎ আমলা, আরেকদিকে অসৎ ব্যবসায়ী আর অন্যদিকে অসৎ রাজনীতিবিদ। পুঁজিবাদের মাধ্যমে আধুনিকতা এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে লক্ষ্য পশ্চিমাদের ছিল, সেটা এখানে হয়নি। রাশিয়াতে এই কাজটা সমাজতন্ত্রীরা করেছে। চীনে পুঁজিপতির নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাজার সমাজতন্ত্র নামের অধীনে মিশ্র বহুগাঠনিক কায়দায় এটা করে চলেছে। কিন্তু আমাদের এখানে রাষ্ট্র বা ত্রিভুজ শাসক শ্রেণী বা উপরের ১ শতাংশের অন্তর্ভুক্ত যে তিনটি গ্রুপের কথা বললাম, তারা জাতীয় পাটাতনে আধুনিকতা বা শিল্পায়নে নিবেদিত নয়। তারা তাদের নিজেদের ধনসম্পদ তৈরি করে বিদেশ উড়াল দিবেন। এরকম পরিস্থিতিতে কিভাবে ৯০ ভাগ মানুষের স্বার্থে দ্বন্দ্বসমূহ একটা পরিণতির দিকে যাবে সেটাই আমরা আগামী দিনে দেখতে পাবো।

মুক্ত আলোচনা

বিনোদ কণ্ঠি (প্রোথাম ম্যানেজার, দক্ষিণ এশিয়া অফিস- দিল্লী, রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং- জার্মানী) : There is a huge differentiation among the peasantry and a big section of population do not own any land. Those who owned the land, the land holding is gradually becoming smaller and smaller and being it nonviable. And also there are some concentration of land in the hands of the rural rich. I assuming the phenomena will be same in Bangladesh and also happening in India. So, in such a fragmented society what are the possibilities of class alliance in rural areas or in the country? The speciality the classes of agriculture workers and the small and marginal farmers and rich farmers? What could be the possible avenue to building a class alliance among the intersections? Is it possible? (জনসংখ্যার একটি বড় অংশ যাদের নিজস্ব কোনো জমি নেই এবং কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিভাজন রয়েছে। যাঁরা জমির মালিক ছিল, তাঁদের জমির মালিকানা ক্রমশ: ছোট থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং তা না থাকার মত এবং একইসাথে গ্রামীণ ধনীদের হাতে জমির পুঞ্জীভবন হচ্ছে। আমি অনুমান করছি যে এরকম অবস্থা ইন্ডিয়াতেও হচ্ছে এবং অচিরেই বাংলাদেশেও একই ভাবে হবে। তাহলে, এমন একটি খণ্ডিত সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণি সংহতির কি ধরনের সম্ভাবনা আছে? বিশেষত কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ধনী কৃষকদের মধ্যে? সকল ইন্টারসেকশনের মধ্যে শ্রেণি সংহতি গড়ার সম্ভাব্য উপায় বা কী হতে পারে? আর সেটা কি সম্ভব?)

এম এম আকাশ: ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব বা অন্যান্য বড় খামারের অঞ্চলের ভূমি মালিকদের মৌলিক চাহিদা থাকে দুইটি: কৃষি উপকরণের দাম কমুক এবং ফসলের দাম বাড়ুক। তারা নগরের পুঁজিপতি ও বাজারের দ্বারা শোষিত। ধনী বাণিজ্যিক চাষী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র কৃষক সকলেই কিছু না কিছু ফসল বিক্রি করে এবং কিছু উপকরণ কিনতে হয়। সুতরাং বাজারের সমস্যার প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও বড় চাষীদের একটা একতা হতে পারে, নগরের শোষকদের বিরুদ্ধে বাজারের মাধ্যমে সম্পদ হাতবদল বা ট্রান্সফারের বা বাণিজ্য শর্তকে প্রভাবিত করে। এই আন্দোলনটা কিছুদিন আগে ইন্ডিয়াতে হয়েছে। সেখানে খুবই সফলতার সাথে ট্রাস্টের নিয়ে চাষীরা এসে দিল্লীর

পাশে দাঁড়িয়ে এই কাজটা করেছে। বাংলাদেশে এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এখানে কিছুটা সম্পন্ন চাষীও আর কৃষিতে থাকছে না। সে কৃষি নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছে না। সে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। তার সন্তানকে সে শেখাচ্ছে যে, কৃষক হয়ো না, তুমি অন্য কোন পেশা বেছে নাও। সে তার জমিটাকে টুকরো টুকরো করে ভাড়াটিয়াদের কাছে কন্ট্রাক্ট দিয়ে দিচ্ছে, এমনকি ভূমিহীন ভাড়াটে কৃষককেও দিয়ে দিচ্ছে। টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া দিচ্ছে। এই অবস্থায় কৃষিতে আগ্রহী হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষকরা। ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকরাই মূলত এখন কৃষিকাজ করছে। তাদের একটা দাবী বর্তমান সরকার কিছুদিন আগে মেনে নিয়েছে, সেটা হচ্ছে বর্গাচাষী জমির মালিক না হলেও কৃষি ঋণ পাবে। অধ্যাপক আবুল বারাকাতের উদ্যোগে ব্যাংক বর্গাচাষীকে ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছিল। ফলে ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন উভয় ধরনের কৃষকের ক্ষেত্রেই একটা কমন দাবী হবে ঋণ পাওয়া, যেটাকে ইনপুট ক্রেডিট বা কৃষি উপকরণ ঋণ বলা হয়। এছাড়া ভর্তুকি মূল্যে কৃষি উপকরণ পাওয়ার দাবীও রয়েছে। এটা বর্তমান সরকার খুব ভাল বোঝে। এজন্য সরকার বিশ্ব ব্যাংকের ভর্তুকি প্রত্যাহারের পরামর্শ মানেনি। যদিও বর্তমানে আওয়ামী লীগ পুঁজিবাদী বা বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও ভাড়াটে কৃষকদের একটা আন্দোলন হতে পারে, কৃষি উপকরণের দাম কমানো আর ফসলের দাম বাড়ানো নিয়ে। এর পাশাপাশি কৃষি ঋণ ও ভর্তুকি অব্যাহত রাখা।

কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে? দুইটি ঘটনা এগুলো পরিবর্তন করতে পারে। প্রথমত, যদি শহরের পুঁজি গ্রামীণ খাতে যেয়ে চুক্তিভিত্তিক চাষ বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং শুরু করে। এছাড়া যদি বড় পরিসরের পুঁজিবাদী খামার চাষাবাদ শুরু করে, আধুনিক সাপ্লাই চ্যানেল তৈরি করে, বিভিন্ন কৃষিজ বাণিজ্য শুরু হয়, কৃষি উপকরণের বাজার পুরোপুরি নিজেরা ব্যবস্থাপনা করতে পারে এবং অল্প কিছু পাইকার দ্বারা ফসলের বাজার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ তারা যদি শুধু বাজারে না থেকে উৎপাদনে যেতে চায়, তখন তাদের প্রধান বাধা হবে তাদের জমিকে এক জায়গায় করা বা একুমুলেট করা। সেটা বাংলাদেশের মত দেশে খুব কঠিন। কার্ল কাউটস্কীর ভাষায় গরীব চাষীর জমিটা হচ্ছে নববিবাহিত বধূর গয়নার মত। সে এটা হাজার কষ্ট হলেও ছাড়বে না। অবশ্য সরকার ভূমি সংস্কার করে এটা করতে পারে। সরকার অনুপস্থিত ভূমি মালিককে ভূমির বিনিময়ে বন্ড বা সঞ্চয়পত্র দিতে

পারে এবং বার্ষিক লাভ দিতে পারে। তখন একটা শ্রমিকশ্রেণী তৈরি হবে। সরকার সেই জমিগুলো সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও দক্ষ পুঁজিপতিদের কাছে লিজ দিয়ে দিবে। যারা বাংলাদেশে সফল পুঁজিবাদী কৃষির স্বপ্ন দেখে এটা তাদের প্রেক্ষিত। আর গ্রামীণ শ্রমজীবীদের দিক থেকে, যদি সেখানেই ঋণ পাওয়া যায়, ভর্তুকিমূল্যে কৃষি উপকরণ পায়, বিপণন-সমবায় করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, তাহলে গ্রামটাকেই শহর বানানো সম্ভব হবে। আর সমাজতন্ত্রীরা বলবে চাইনিজ সিস্টেমের কথা। হাউজহোল্ড রেসপনসিবিলিটি সিস্টেম অর্থাৎ জমিটা ব্যাংক বা যেভাবেই রাষ্ট্রের আওতায় নেওয়া হোক না কেন, পরে আর প্রাইভেট খাতকে না দিয়ে, তাদেরকেই আবার সাপোর্টসহ ফিরিয়ে দেওয়া হল। এটা বাকশালের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান কিছুটা করতে চেয়েছিলেন। ফসলের ৩টি ভাগ হবে: ১ ভাগ উপকরণ প্রদানকারীর বা সরকারের, ১ ভাগ যারা শ্রম দিয়েছে তাদের, আর ১ ভাগ ঐসব জমির শেয়ারহোল্ডাররা পাবে। এটি একটি অভিনব পদ্ধতি এবং এটি সমতা, প্রবৃদ্ধি, দক্ষতা, উৎপাদক শ্রেণির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে।

সুরাইয়া বেগম: আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি যে, কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলো তাদের পুঁজিটাকে গ্রামাঞ্চলে খাটাচ্ছে এবং পুঁজির পুঞ্জীভবনের চেষ্টা আছে। এতে কৃষি প্লটগুলো ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা একতাবদ্ধ নয়। এখানে যদি কার্ল মার্কসের শ্রেণি চেতনার কথা নিয়ে আসি, তাহলে সেই চেতনা কিভাবে বিকশিত হবে এবং এক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারা ভূমিকা রাখবে? সাধারণ কৃষক তো ভরসার কোন জায়গা পাচ্ছে না। রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্র, পুঁজিপতি কারও কাছেই ভরসার জায়গা পাচ্ছে না। তাহলে তাদের মধ্যে শ্রেণি চেতনা জাগ্রত হবে কিভাবে?

এম এম আকাশ: যারা কৃষিতে শ্রম দিচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা ছোট ভাগ আছে, যারা পুরোপুরি কৃষি শ্রমিক। তাদের প্রধান পেশা কৃষি শ্রমিক, যাদেরকে আমরা আগে ক্ষেতমজুর বলতাম। এই সংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে। কৃষি শ্রমিকদের একটা পা কৃষিতে, অন্য পা অকৃষিতে। কিন্তু পিক সিজনে যখন শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে যায়, কিন্তু শ্রমিক সরবরাহ কম থাকে, তখন দলবদ্ধ কৃষি শ্রমিকদের এক ধরনের দরাদরি দেখা যায়। এসময় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে দলবদ্ধ শ্রমিকরা কাজ করতে যায়, তারা একত্রে থাকে এবং সে অঞ্চলের নিয়োগকারী চাষীদের সাথে দরাদরি হয়। এসময় কতগুলো ইস্যু উঠে আসে, যার ভিত্তিতে শ্রেণি চেতনা জাগ্রত হতে পারে।

প্রথমত, ফসলের দামের ভিত্তিতে যৌথভাবে ধান কাটার মজুরি দাবী করা হয়। গ্রামের কৃষকরা একদিকে এবং ক্ষেতমজুররা অন্যদিকে, দুই পক্ষ মিলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইনসার্ফের মজুরি নির্ধারণ করতে চায়। এই ইনসার্ফের মজুরির প্রশ্নে একটা আন্দোলন হতে পারে। অন্যদিকে গ্রামে সরকারের যে ভর্তুকি বা সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় ভাতা বা উন্নয়ন বরাদ্দ আসে, সেগুলো ধনী কৃষক বা রুলিং ক্লাস গ্রাস করে। আমি যে তিন ধরনের দুর্নীতিবাজের কথা বলেছি, তার শাখা তো গ্রামেও আছে। তাদের বিরুদ্ধে গরীব মানুষের মাল্টিক্লাস বা নানা শ্রেণির যৌথ আন্দোলন হতে পারে। তারা ভাবতে পারে যে, তারা যদি একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ দখল করে উন্নয়ন বরাদ্দগুলো সুষ্ঠুভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। বাজারের বিরুদ্ধে একটা যৌথ আন্দোলন হতে পারে। একত্রিত হয়ে, সেঞ্চ হেল্প গ্রুপ করে জিনিসপত্রগুলো তারাই বিক্রি করবে এবং কৃষি উপকরণও তারাই কিনবে। এছাড়া ঋণের জন্য আন্দোলন হতে পারে। আর বর্গাচাষীরা জমি চাষের শর্ত বা ভাড়ার হার ঠিক করার জন্য দর কষাকষি করতে পারে। কিন্তু এই ইস্যুগুলো নিয়ে ওদের কাছে এজেন্টকে যেতে হবে। শামসুজ্জামান সেলিমের মত মানুষ (সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সভাপতি), যারা এসব নিয়ে চিন্তা ও কাজ করতেন, এরকম শত শত মানুষ লাগবে এবং ঐসব জায়গায় কাজ করতে হবে। কাজ করলে এরকম দল, ফেডারেশন তৈরি হবে। এরপর গ্রামের মধ্যে শোষিত মানুষের বা ৯০% মানুষের মাল্টিক্লাস বা বহুশ্রেণিভিত্তিক আন্দোলন হতে পারে।

মাহমুদুল করিম: নারীরা বাসা থেকে বাইরে যাচ্ছে এটাকে অগ্রগতির সূচক হিসাবে দেখানো হয়েছে। আবার দেখা যাচ্ছে তার বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টের পিন নাম্বার তার স্বামীর কাছে থাকে। এই দুটো সাংঘর্ষিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা কী ধরনের অগ্রগতি বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি? এটা কোন শ্যাডো প্রগ্রেস বা ছায়া উন্নয়ন কিনা? ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে শ্রমিকদের মধ্যে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ খুবই কম। ১৯৯৬ সালে তা ৮ ভাগ ছিল, ২০১৭ এর জরিপে ৩৬ ভাগ হয়েছে। এর সাথে সম্পৃক্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছিল। অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি খুব শক্তিশালী হলে পুঁজির বিকাশের সাথে তা সাংঘর্ষিক হয় কিনা বা এই দুটো সহাবস্থান করে কিনা?

এম এম আকাশ: প্রথম প্রশ্নের সাথে মূল্যবোধ বা ভ্যালু সিস্টেম জড়িত। সমাজের মূল্যবোধ যদি যথাযথ না হয় বা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ যদি পরিবারে থাকে এবং নারীদের কাজ ছোট চোখে দেখা হয়, তাহলে এসব দূর না করে নারীকে শুধু ঘর থেকে বাইরে কাজ করতে দিলে, সেটা যথেষ্ট হয় না। তাকে কাজের পরিবেশ দিতে হবে। এখানে পরিবেশ কথাটা ব্যাপকার্থে বলা হচ্ছে। যেমন মোবাইল ফোন ব্যবহারের অনুমতি। কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেও এই অনুমতি আগে ভাই পায়। এর পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়টাও আছে। কারণ মোবাইল ব্যবহারের ফলে যদি নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়, কারণ দেশে ভ্যালুজ খুব খারাপ এবং সব দিক থেকে নারীকে আক্রমণ করা হয়। বাংলাদেশে নারীদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বেড়েছে, তবে সংখ্যাবাচক সূচকের দিক থেকে অগ্রগতি হলেও গুণবাচক দিক থেকে গভীর হচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ সামাজিক মূল্যবোধ বা সোশ্যাল ভ্যালুজ। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখা যায়, নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেলেও, মূল্যবোধের দিক থেকে তারা অতটা আধুনিক হয়নি। এটা কতটুকু ধর্মীয় কারণে, আর কতটুকু সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতার কারণে, সেটা সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বলতে পারবেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পুঁজিবাদ বিকশিত হয় না। সব জায়গায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে প্রযুক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শেষ করে দিয়ে, বিশাল পরিসরের (লার্জ স্কেল) আধুনিক পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের মত দেশে এটা খুব যন্ত্রণার হবে। আমাদের শ্রমিক শ্রেণির ৮০ ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে স্ট্যাটালিনিস্ট কায়দায় জোর করে আধুনিক খাতে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির সব আইল উঠিয়ে দিয়ে আধুনিক ট্র্যাক্টর দিয়ে বিশাল আধুনিক খামার তৈরি করলে এবং সবাইকে আধুনিক শ্রমিক বানাতে, সেটা খুবই আধুনিক ও পুঁজিবাদী উন্নয়ন হবে। কিন্তু তার গর্ভযন্ত্রণাটা হবে খুব সাংঘাতিক। মধ্যম উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো আধুনিকায়ন করেছে এবং তার চারপাশে স্যাটেলাইট অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প করেছে। আধুনিকতা যতটা অগ্রসর হয়েছে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ততটা কমেছে। দুটো খুব ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে। একটা বেড়েছে, একটা কমেছে, কিন্তু কমা এবং বাড়ার গতির মধ্যে একটা ভারসাম্য ছিল। অথচ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমরা ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আধুনিক

প্রাতিষ্ঠানিক খাতে বা গার্মেন্টস খাতে যেতে পারছি না। কারণ এখানে বিনিয়োগ হচ্ছে না, টাকাটা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমাদের পুঁজিবাদের এই চরিত্রের কারণে যে সংকট তৈরি হচ্ছে, এজন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত দায়ী নয়। এটার জন্য আধুনিক পুঁজিবাদের চরিত্র দায়ী। তার যেটা করার কথা ছিল, যেরকম জাতীয় চরিত্র হওয়ার কথা ছিল, তার সেটা নাই। সে অত ঝামেলাও করতে চাচ্ছে না। চলে যেতে চাচ্ছে বাইরে, টাকাটা এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদের ধর্ম হচ্ছে সম্প্রসারিত হওয়া, পুনর্বিনিয়োগ করা, নতুন প্রযুক্তি আনা। বর্তমানে দেশে কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে, কিন্তু পিক সিজনে ফসল কাটার জন্য হার্ভেস্টার যন্ত্র চলে আসছে। অন্যদিকে এসব কৃষি যন্ত্র তৈরির কারখানা এখানে হচ্ছে না, এর ফলে হার্ভেস্টার যন্ত্রের কারণে যারা বেকার হবে তারাও চাকরী পাচ্ছে না। সুতরাং বাংলাদেশে আর্টিকুলেটেড ইকোনমিক প্রসেস হচ্ছে না। এই কারণে পুঁজিবাদী উন্নয়ন বা আধুনিকায়নও হচ্ছে না। এটার জন্য আমি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে দায়ী করবো না। এটা আমি শিল্পখাতের নেতৃত্বকে দায়ী করবো। বিশেষ করে রাষ্ট্রকে দায়ী করবো।

ড. মোঃ নাজিম উদ্দিন (সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট- বারি): আমাদের রাষ্ট্রটা কী পুঁজিবাদী নাকি আধাসামন্ততান্ত্রিক? আজকের বক্তব্যে এম এম আকাশ দুটো অবস্থানের কথা বললেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও বামপন্থী মহলে এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে। আমার মনে হয়, এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা উচিত। যদি এটাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এখানে পুঁজির অবস্থা ভগ্নদশা, জনগ্রহণ করেছে কিন্তু বিকলাঙ্গ বা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। ক্লাসিক্যাল বা প্রুপাদি পুঁজিবাদে শিল্প খাতকে কেন্দ্র করে রূপান্তরণ হয়। কিন্তু স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানে ২২ আদি ধনী পরিবার ছিল, এর মধ্যে বাংলাদেশে ছিল ২ পরিবার এবং এখানে পরিবারকেন্দ্রিক পুঁজির বিনিয়োগ হয়নি। তখন অর্থনীতির রূপান্তরণের ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কলকারখানার মালিকানা নেয় রাষ্ট্র। যদিও এটা সমাজতন্ত্রের এক ধরনের রাজনৈতিক কৌশল ছিল এবং পুঁজিবাদের রূপান্তরের জন্য করা হয়েছিল। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পর একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এর অঙ্গগুলো নানা সময়ে বিকশিত হয়েছে। বিশেষ করে শিল্প খাত বেশী বিকশিত হয়েছে।

এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিখাতে যে পুঁজির বিকাশ হচ্ছে, সেটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই রূপ। জাপানের দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষুদ্র কৃষকরা বেশী এবং সেখানে বড় ইন্ডাস্ট্রি নয় বরং ক্ষুদ্র কৃষকরাই কৃষি বিপ্লব করেছে। এটা আমাদের জন্য একটা উদাহরণ হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া-চীন এবং পুঁজিবাদী ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রের একটা মধ্যবর্তী জায়গায় জাপানকে রাখা যেতে পারে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার পূর্বাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক ক্ষুদ্র কৃষক। কিন্তু আমরা ৫০ বছর পরেও কেন অর্থনীতির চরিত্র স্পষ্ট করে বলতে পারছি না? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রের অঙ্গগুলো বিকশিত হয়নি। আমাদের রাষ্ট্র বিশ্বব্যাংককে উপেক্ষা করে কৃষিতে তরুঁকি অব্যাহত রেখেছে, আবার অনেক জায়গায় আবার টিকে থাকার জন্য আপোসও করেছে। এটা হয়ত কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের স্বার্থেই বিশ্বব্যাংক মেনে নিচ্ছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-এ কৃষির যে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে, কৃষিতে কর্পোরেট ব্যবস্থার বিকাশ করা হবে। এখান থেকে সরকারের রাজনৈতিক ও অবস্থানগত চরিত্র বোঝা যায়। বড় পুঁজি কর্তৃক ছোট পুঁজিকে গ্রাস করার যে চরিত্র, সেই হিসাবে ছোট ছোট জমিগুলো কর্পোরেটদের কাছে চলে যাবে এবং কৃষকরা কারখানায় বা কর্পোরেটদের খামারে কাজ করবে, এমন একটা লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এটা মূলত বর্তমান ব্যবস্থারই আধুনিকায়ন। আবার কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতিতেও ছোট ছোট খামারকে বড় খামারে রূপান্তরিত করা যায়। এটা আবার একটা বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যু এবং এই ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনও নাই। অর্থাৎ কৃষিকে আরও বড় পুঁজিবাদী কাঠামোতে কিভাবে যুক্ত করা যায়, সেই দিকেই রূপান্তরটা হচ্ছে। এরকম অবস্থায় আবার শিল্প পুঁজিগুলো দৈন্যদশায়ও ভোগে। যেমন খবরের কাগজে আমরা দেখেছি বড় পুঁজিপতিরা পাকিস্তানেও বিনিয়োগ করে। বড় শিল্পগোষ্ঠীরা পুঁজিকে স্থানান্তরিত করে ফেলছে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে সরাসরি সহায়তা করছে। এমন বাস্তবতায় কেন আমরা বলছি না যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোটা পুঁজিবাদী, তবে নানা দুর্বলতা আছে। এরকম কেন বলতে পারছি না?

এম এম আকাশ: পুঁজিবাদ একটি বড় প্রপঞ্চ। ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদি পুঁজিবাদ এখানে হচ্ছে না। ধ্রুপদি পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পুঁজি দিয়ে শ্রম শক্তি ও মিনস্ অফ প্রডাকশন (উৎপাদনের উপায়) কেনা হয়, এরপর একটা পণ্য উৎপাদন করা হয়, সেগুলো বিক্রি করে বর্ধিত মূল্য পাওয়া যায়, এই বর্ধিত মূল্যের এক অংশ পুঁজিতে যোগ করে পুনর্বিনিয়োগ করা হয়, এইভাবে

ক্রমবর্ধমান পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে পুঁজি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পুঁজি বৃদ্ধি পাওয়ার এই প্রতিযোগিতায় অদক্ষরা ঝরে যায়, যারা দক্ষ বা বাজারে ক্রমবর্ধমান শেয়ার দখল করে, তারা একচেটিয়া কারবার শুরু করে, তারপর নিজের দেশে স্যাচুরেটেড হয়ে গেলে দেশের বাইরে বিনিয়োগ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী হয়ে যায়। আমাদেরও অর্থনীতি পুঁজিবাদী, কিন্তু মজা হচ্ছে এটা ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ। এখানে বাইরে থেকে পুঁজিবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজি ভারতবর্ষে আসার পর, দেশীয় পুঁজির (লক্ষী নারায়ণ কটন মিল, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি) সাথে একটা দ্বন্দ্ব ছিল, যার মিমাংসা হয়নি। ঐ ঔপনিবেশিক পুঁজি আমাদেরকে একটা রাষ্ট্র দিয়েছে, যার চরিত্র প্রো-প্রোডাকটিভ পুঁজিবাদ নয়। ফলে এইটা পুঁজিবাদ হলেও এটি গতিশীল নয় এবং জাতীয়তাবাদী নয়। তাহলে রাষ্ট্রের চরিত্র এমন একটা রুশিং ক্লাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যারা গতিশীল বা জাতীয়তাবাদী পুঁজিপতিদের পক্ষে থাকতে চায় না। এটা একটা মিশ্র অবস্থানে আছে। ফলে টাকা বাইরে পাচার হয়ে গেলেও আটকায় না, আবার ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উৎপাদনশীল পুঁজি না তৈরি করে ঋণখেলাপী হলেও তাকে শাস্তি দেয় না। কিন্তু ধ্রুপদি পুঁজিবাদে এইটা সম্ভব ছিল না। ফলে পুঁজিবাদের প্রভাব আমাদের দেশে বেশী এবং পুঁজিপতিরা হচ্ছে শাসক শ্রেণি। কিন্তু পুঁজিবাদের যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব করার কথা ছিল, যেটা পশ্চিমের দেশগুলোতে হয়েছে, সেটা আমাদের দেশে হচ্ছে না।

মোঃ ইফতেখার আলী: এই লুটেরা পুঁজিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রিইব এর প্রাণ-প্রকৃতি সুরক্ষার কাজে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

এম এম আকাশ: সমাজে শ্রেণি থাকলে, শ্রেণি স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে। শ্রেণি স্বার্থের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই সমাজে অগ্রগতি হয়। এটার ব্যালেন্স অফ ফোর্সাই সমাজের অগ্রগতি নির্ধারণ করে। এখন রাষ্ট্র এমন পুঁজিকে সমর্থন দিচ্ছে, যা পশ্চিমে যেভাবে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছে, তা করছে না। পশ্চিমে পুঁজিবাদ সামন্তবাদকে ধ্বংস করেছিল, ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে সহায়তা করা হয়েছিল, নতুন প্রযুক্তির সূচনা করে বিশ্বজয় করেছিল এবং তারা কৃষির উদ্ভূত জনসংখ্যাকে টেনে এনে অন্য কর্মসংস্থান দিয়েছিল এবং এর মজুরি হার শুরুতে কম থাকলেও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা আধুনিক রাষ্ট্রে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অনেক হবে, কিন্তু পুঁজিবাদের

কারণে এর বিতরণ হবে অসম। তবে অসম হলেও এতে দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। সেটা বাংলাদেশে হচ্ছে না। কেউ কেউ বলে কিছুটা হচ্ছে, যেমন কৃষিতে প্রকৃত মজুরি কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু বেকারত্ব আসলে কতটুকু? আমার মতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেই আসলে কর্মসংস্থান হচ্ছে। আধুনিক পুঁজিবাদী খাতে তো কর্মসংস্থান হচ্ছে না। আর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পুঁজি বা প্রযুক্তি বা জ্ঞান আসছে না। সবাই এখানে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব দূর না করতে পারলে তো কিছু হবে না। আমাদের পুঁজিবাদের যেসব নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন স্বজনতোষণমূলক পুঁজিবাদ বা ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ, ওভার ডেভেলপড স্টেট- এরকম যেসব সিদ্ধান্তে মানুষ পৌছাচ্ছে, সেগুলো দেখলে মনে হয় না যে এরকম কোন সম্ভাবনা আছে। লেনিন যখন ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া-তে আলোচনা করেছিলেন, তখন বলা হয়েছিল দুই ধরনের পুঁজিবাদ হয়: একটা নীচ থেকে আসে, আরেকটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। নীচ থেকে বিকশিত হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে, আকিজ বিড়ির মত পুঁজিবাদ। এরকম হলে বাংলাদেশে পুঁজিবাদ নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতাও পেরে। কিন্তু আমাদের এখানে তা হচ্ছে না। বরং মানুষের কাছে পুঁজিবাদ এখানে খারাপ জিনিস, এর বিরুদ্ধে তারা বিক্ষুব্ধ। কিন্তু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণি সংগ্রাম বা ক্লাস স্ট্রাগল হচ্ছে না। কারণ প্রলেতারিয়েত ভাবছে যে, সে যদি আধুনিক খাতের বা গার্মেন্টেসের চাকরিটা হারায়, তাহলে তো আবার গ্রামে ফিরতে হবে। আবার এখানে সংগ্রাম করে টিকে থেকে উন্নততর কারখানায় যাওয়ার সুযোগও নেই। এজন্য এখানে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন বা মালিকানার আন্দোলনের চেয়ে চাকুরির আন্দোলনটা প্রাধান্য পায়। ফলে একই সঙ্গে দুইটি লড়াই করতে হচ্ছে: উৎপাদক শ্রেণি বিকশিত করার সংগ্রাম এবং এক্ষেত্রে বিতরণ প্রক্রিয়া সামাজিকভাবে ন্যায্য করার আন্দোলন। পুঁজিবাদের মধ্যে যে শ্রেণি সংগ্রাম সেটা মূলত বিতরণ প্রক্রিয়াকে ন্যায্য করার সংগ্রাম। কিন্তু উৎপাদক শ্রেণি বিকাশ না হওয়ায় সেটা টেকসই হচ্ছে না, অথবা এমন আন্দোলন হচ্ছে যে মালিক কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, বাইরে নিরাপদে পুঁজি পাচার করে দিচ্ছে। এইটা পুঁজির নির্মম শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী লেনদেন জাতীয় পুঁজির বিকৃতি বা অসহায়ত্ব আর এগুলোই হচ্ছে সমস্যা।

তৃতীয় দিন : ২২ আগস্ট ২০২৩

নারীবাদ: আন্দোলন ও শ্রেণি সম্পর্ক

সুরাইয়া বেগম: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ প্রতিবেশ ও জেভার ন্যায্যতা বিষয়ক যে প্রকল্পটি নিয়ে কাজ করছে তা পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা এবং বগুড়া জেলার মোট ছয়টি গ্রামের নারী, পুরুষ কৃষক এবং যুবদের সহযোগে। মাঠভিত্তিক এই গবেষণা কাজে মূল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ে সচেতনায়নে একশন রিসার্চমূলক গবেষণা কাজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গণগবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক জনগোষ্ঠীর সচেতনতার জায়গা তৈরী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, যাতে তারা জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে নিজেদের আত্ম-উন্নয়ন করতে পারে। এই বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে সমস্যা প্রবল এবং সেখানে শ্রেণি একটা বড় বিষয়। এছাড়াও কৃষিতে জেভার ইস্যুটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাজের মাধ্যমে দেখেছি যে, বর্তমানে কৃষিতে নারীর সম্পৃক্ততা বাড়ছে কিন্তু নারীর কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে না। মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিসরে জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এবং বাজার কেন্দ্রিক কৃষি অনেকটাই জেভার পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্রতিবেশ বিরোধী। নারী কৃষক সেখানে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান কোথায় এবং শ্রেণি সম্পর্কের আলোচনায় এই কৃষক নারীকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তা আলোচনার বিষয়। এই বিষয়গুলো যতবেশি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় চর্চা করা যায়, জ্ঞানের পরিসর ততবেশি সমৃদ্ধ হতে পারে। মাঠভিত্তিক একশন রিসার্চমূলক কাজে তত্ত্বের চেয়ে ব্যবহারিক কাজটাই বেশি ফোকাস পেয়ে থাকে, ফলে একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে যায়। সেই অসম্পূর্ণতাকে দূর করে আমাদের চিন্তার জগতটাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে আমাদের এই উদ্যোগ।

আমরা জানি যে, বাংলাদেশে নারী আন্দোলন নিয়ে কাজ হচ্ছে কিন্তু শ্রেণি সম্পর্কের আলোকে এই বিষয়টা আরও বিশদভাবে আলোচনা করার গুরুত্ব অনুধাবন করেছি। সেই প্রেক্ষিতেই আজ নারীবাদ: আন্দোলন ও শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করবেন রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।



ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা

নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ

নারীবাদ: আন্দোলন ও শ্রেণি সম্পর্ক

মেঘনা গুহঠাকুরতা: নারীবাদী চিন্তাধারার প্রথম পর্যায়ে কোনো শ্রেণি চিন্তাধারা যুক্ত ছিল না। তখন মুখ্য চিন্তা ছিল নারীপুরুষের মধ্যকার বৈষম্য ও এই বৈষম্য থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নারীর সংগ্রাম। পরবর্তীকালে কাঠামোবাদী অর্থাৎ স্ট্রাকচারালিস্ট ভাবধারায় শ্রেণিকাঠামো অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় সেটা প্রতিফলিত হয়। নারীবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বা মার্ক্সীয় ভাবধারা দুটোই কাঠামোবাদী বা স্ট্রাকচারালিস্ট ভাবধারা থেকে উৎসারিত। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার কেন্দ্রে রয়েছে শ্রেণিকাঠামো, আর নারীবাদী ভাবধারার কেন্দ্রে রয়েছে পিতৃতন্ত্র। শ্রেণিতন্ত্রের ভাবধারা প্রবলতর হয় সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের মাধ্যমে। সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদী ধারণায় শ্রেণি সংগ্রামকেই সমাজের অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি হিসেবে মনে করা হয়েছে, তারপরে নারী অধিকার। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা যদিও শ্রেণি বিশ্লেষণকে মূখ্য ভূমিকায় রেখেছেন, তারা পিতৃতন্ত্রকে যোগ করেছেন সেই সমাজ বিশ্লেষণে। আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা

ভেবেছেন, নারীমুক্তির সংগ্রাম শ্রেণি সংগ্রামের সাথে যুক্ত না হলে, নারীমুক্তি আসবে না এবং এইজন্যই শ্রেণি সংগ্রামের বাইরেও নারী সংগ্রাম পৃথকভাবে চালাতে হবে। এই বিতর্ক ও ভাবনা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার অনেকটা জুড়েই ছিল এবং এখনো আছে। অন্যদিকে র্যাডিকাল নারীবাদ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। নারী ও পুরুষের ক্ষমতার লড়াই, সেখানে অন্য কোনো সামাজিক বিশ্লেষণ যেমন- শ্রেণি কোনো গুরুত্ব পায় না। তবে অনেকের ধারণা যে র্যাডিকাল নারীবাদ নারীকেই একটি শ্রেণি হিসেবে দেখেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে পিতৃতন্ত্রের ধারণা ও শ্রেণিকাঠামো, দুটোই কাঠামোবাদী বা স্ট্রাকচারালিস্ট ভাবধারা থেকে উৎসারিত। কারণ দুটোরই কেন্দ্রে রয়েছে গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ বা বৃহত্তর আখ্যান। কিন্তু উত্তর কাঠামোবাদীরা অর্থাৎ, পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্টরা এই ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্বাস করেনি। তারা শ্রেণি বা নারী-পুরুষ ধারণাগুলোকে ডিকস্ট্রাক্ট বা বিনির্মাণ করেছেন নানাভাবে। এ আলোচনায় এখন আসা যাক। বিনির্মাণের লক্ষ্য ছিল সে সকল ধারণা, যেগুলো পাশ্চাত্যের চিন্তার উৎস হয়েও একটি বৈশ্বিক রূপ লাভ করেছে। যেমন: পিতৃতন্ত্র। বিনির্মাণবাদীরা বলেন যে, পিতৃতন্ত্র সব সমাজেই একভাবে দেখা দেয় না। এটি উন্মোচিত হয় তাদের এই ভাবধারায়। নারী প্রত্যয়টির ভিন্নতা আছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান বুঝে। যেমন: আদিবাসী নারী, দলিত নারী, শ্রমজীবী নারী। নারী-পুরুষের মেরুকরণও মানে বাইপোলারিটি চ্যালেঞ্জ করেছে তারা তৃতীয় লিঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডারের ব্যাখ্যা নিয়ে এসে। অর্থাৎ, নারীবাদের কোনো একক সংজ্ঞা না দিয়ে তারা এর মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে। আবার একই সঙ্গে নারীর প্রতি বৈষম্য মনে রেখে তারা এনেছে ইন্টারসেকশনালিটি বা অন্তঃসংযুক্তির কথা। এটা একটা মেথডলজি হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে শ্রেণি প্রত্যয়টিও যে সবকিছু ব্যাখ্যা দিতে পারে, সেটাও উঠে এসেছে এই ভাবধারাতে। যেমন- দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে ইতিহাসবিদ রনজিত গুহ উদ্ভব করেছিলেন সাবঅলটার্ন বা নিম্নবর্গীয় ধারণা। এর যুক্তি হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের উপনিবেশিক সমাজকাঠামো ও উপনিবেশিত দেশের সমাজকাঠামো, শ্রেণিব্যবস্থা ও সমাজগঠন ভিন্নতর। ফলে অনেক জনগোষ্ঠী যেমন- দলিত, আদিবাসী এমনকি নারীও মূলধারার শ্রেণিবিন্যাস থেকে পৃথক থেকে গেছে। তারা উপনিবেশিক রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করে এবং ক্ষণে ক্ষণে রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই ধারণা নারীবাদীদেরকেও প্রভাবিত করেছে।

বৈশ্বিক এই নারীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আমরা এখন বাংলাদেশের নারীবাদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আসতে পারি। নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কারা বাংলাদেশে? আমরা বিভিন্ন ধরনের সংগঠন দেখতে পাই। এক হচ্ছে নারী সংগঠন যাদের নেতৃত্বে নারীরাই আছে, আবার একই সঙ্গে তাদের

পুরো এজেন্ডাটাই নারীকেন্দ্রীক। অপরদিকে আরো সংগঠন আছে— শ্রমজীবী সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন। যাদের মিশন এবং এজেন্ডাগুলো পৃথক পৃথক। কিন্তু তারা নারী ইস্যুতে মাঝে মাঝে একত্রিত হয়। সেটা একটা সার্বিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারে। অন্যদিকে আছে দলীয় রাজনৈতিক দলগুলোর যে বিভিন্ন নারী ফ্রন্ট, তারাও অংশগ্রহণ করে মাঝেমাঝে এই আন্দোলনে। নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রকৃতিগুলো কি? সেই আন্দোলনের প্রকৃতির সাথে শ্রেণি সম্পর্কেরই বা কী ধরনের যুক্ততা? আমরা দেখেছি যে অধিকাংশ নারী আন্দোলনের এজেন্ডাগুলোর লিড দিচ্ছে শহুরে মধ্যবিত্ত নারীরা। এর একটা কারণ হতে পারে যে শ্রমজীবী নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে কম এবং তারা নেতৃত্বেও কম আসছে। তাদের যেই সংগঠনগুলো, সেগুলো নারী সংগঠন নয়। তারা যখন উঠে আসতে চাচ্ছেন, তাদের বাধা অনেক বেশি হচ্ছে।

অন্যদিকে মূলধারার নারী এজেন্ডাগুলি আমরা দেখেছি যে, সেখানে কিন্তু রাষ্ট্র এক ধরনের করায়ত্ত করেছে, অর্থাৎ এটা এক ধরনের শ্রেণিবিবর্জিত এজেন্ডা। যেমন, উন্নয়নে নারী। সেটা তারা সকল ধরনের নারীর কথাই বলছে এবং উন্নয়নের ব্যাখ্যাটাও শ্রেণিবিবর্জিত। কার উন্নয়ন হবে, কিভাবে উন্নয়ন হবে, কে এর ফসল পাবে, এগুলোর মধ্যে তারা যাচ্ছেনা। উদারনৈতিক নারীবাদের প্রথম প্রহরে যেই ধরনের নারীবাদ এসেছিল, তার কিছুটা সামঞ্জস্যতা আছে। আন্দোলনের সেই ধরনের এজেন্ডাটা মোটামুটি এক ধরনের রাষ্ট্রিক একটা কাঠামোর মধ্যেই আসে। অন্যদিকে আমরা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধী নারী এজেন্ডাটাকে কিভাবে দেখব? সেখানে যেসব শ্রমজীবী নারী সংগঠনগুলো নেতৃত্ব নেয়, সেখানে কিন্তু অবশ্যই শ্রেণি সম্পর্কটা চলে আসে। যেমন, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে নারীদের ইস্যুগুলো তারা নিজেরাই নিয়ে আসে এবং অবশ্যই এটি শ্রেণিযুক্ত একটি এজেন্ডা। সেখানে অনেক সময় মধ্যবিত্ত নারীরাও অংশগ্রহণ করেন। যদি এই সমস্যাগুলো একটা উন্নয়নের দিকে যায়, যেমন— গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারগুলো এবং এসব নারীদের প্রতি যে ভায়োলেন্স বা সহিংসতা দেখানো হয়, সেই ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করতে গিয়ে অনেক সময় মধ্যবিত্ত নারীরাও চলে আসে। আমরা একভাবে বলতে পারি যে মধ্যবিত্ত নারীরা তখনই একাত্মতা প্রকাশ করে যখন এই ইস্যুগুলো মূলধারায় চলে আসে বা রাষ্ট্রীয় আদলে যখন এটাকে উত্থাপন করা হয়, সেটা মিডিয়ার মাধ্যমে হতে পারে। আবার এমনিতেও সহিংসতার প্রকৃতি এতটা প্রকট হয় যে তখন এটা একটা সোশ্যাল ইস্যু হিসেবে চলে আসে। তখন বিভিন্ন ধরনের নারীদেরকেও একাত্মতা প্রকাশ করতে দেখি। কিন্তু মধ্যবিত্ত নারীর সাথে যে যোগসূত্র, আমার বিশ্বাস যে এটা সবসময় নেগেটিভ না, এটা একতাবদ্ধ হলে একটা সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে। সেই হিসেবে নারীর যে

এজেন্ডা, এটা অনেকটাই তারা এটা শক্তিশালী করতে পারে, কিন্তু সেটা অল্প কয়েকটা ঘটনাগুলো যে ঘটে যেগুলোতে আমরা দেখতে পারি। যেমন— কল্লনা চাকমার অপহরণ। একটা সামরিকীকরণের ইস্যুর মধ্যে এটা চলে এসেছে। তার জন্য অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে বেগমগঞ্জের সাহসিকার যে গণধর্ষণ, সেটার যে কেস ফাইল করা হয়েছে, সেখানেও কিছু নারী এই সেতুবন্ধনটা তৈরি করতে পেরেছে। অন্যদিকে নিম্নবর্ণীয় নারী আন্দোলন যেগুলো, যেমন— আদিবাসী নারী, বা শ্রমজীবী নারী, বা দলিত নারী, তাদের যে সংগ্রামগুলো হয়, সেখানে অবশ্যই শ্রেণিসম্পর্ক যুক্ত হয়। কিন্তু একইসাথে সেখানে নারীদের কণ্ঠগুলো ক্ষীণ হয়ে যায় অর্থাৎ প্রান্তিক হয়ে যায়। এই জায়গাটাই লক্ষণীয় যে তখন শহুরে শ্রেণি বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা মূলধারার যেই নারীরা আছে, তাদেরকে দিয়ে সেই সেতুবন্ধনটা তৈরি করা যায় যে, ক্ষীণ কণ্ঠগুলোকেও জোরদার করে তারা অনেকটা শক্তিশালী করতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে শ্রেণিসম্পর্কে নারী আন্দোলনে আরো জোরদার করতে গেলে কি করা দরকার? এটা অবশ্যই আমরা জানি যে, প্রতিবাদী যেই নারীরা আছেন, বিশেষ করে যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আসেন, তাদের কণ্ঠগুলো আমরা আদৌ শুনতে পাই কি না? এই প্রশ্নটা জাগে এবং সেই কণ্ঠগুলোকে আরো শক্তিশালী করার উপায় কি বা পদ্ধতিগুলো কি? সেই পদ্ধতিগুলোর চর্চা বা সেই দিকে নজর কি আমাদের বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে আছে? এই প্রশ্নটাই এখন আমাদের জাগে। একটা পদ্ধতির কথা বলতে পারি যেখানে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ একটি উদ্যোগ নিয়েছে এবং এটা আস্তে আস্তে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্নভাবে ছড়াচ্ছে। সেটা হচ্ছে পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ অর্থাৎ একে অনেকেই বলেন অংশগ্রহণমূলক গবেষণা কিংবা গণগবেষণা। এখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীরা, তারাই কিন্তু তাদের যে সমস্যা সেগুলি সংজ্ঞায়িত করে। সংজ্ঞায়িত করে এগুলোর চ্যালেঞ্জগুলোকে তারা আইডেন্টিফাই করে এবং কোন কোন সমস্যা অগ্রাধিকার পাবে তাদের জন্য সেগুলো মিলিতভাবে তারা আলোচনা করে। এই মিলিতভাবে আলোচনা করার পর তারা আবার অগ্রাধিকাররূপে এটাকে নিয়ে আসে। মানে কোন সমস্যাটাকে আগে তারা বিচার করবে বা বিশ্লেষণ করবে আর কোন সমস্যাটাকে পরে সমাধান করবে। এভাবে যদি ১, ২, ৩ অগ্রাধিকার করে, তখন আমরা দেখি যে নারীরা একটা একশন নিতে উদ্যোগী হয়। যেহেতু এটা একশন রিসার্চ, তাদেরকে একশন হিসেবেই ওই রিসার্চ বা গবেষণার মধ্যেই একশনটাকে নিতে হবে। এই করে তারা যখন একশনটা নেয় তখন এর ফসলটা কি হলো, সেটা নিয়ে আবার বিশ্লেষণ করে। এই পদ্ধতিটাকে প্র্যাক্সিস বলা হয়। আমরা দেখেছি এটা খুব কার্যকরী একটা পদ্ধতি যেখানে এক হচ্ছে নারীর কণ্ঠগুলো শোনা যায়। তাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যেও

শোনা যায়। তারা বিভিন্নভাবে অবদমিত, তারা শুধু মূলধারার সমাজ দ্বারাই অবদমিত না, তারা নিজেদের পরিবারে যেই পুরুষ সদস্যটি আছে, তাদের দ্বারাও অবদমিত। তাদের স্থানীয় যে ক্ষমতার কাঠামো আছে, সেগুলো দিয়েও অবদমিত। তো সেখান থেকে তারা একটা কণ্ঠ পায়, একটা আর্টিকুলেশন চলে আসতে পারে। সেই আর্টিকুলেশনটা তারা যখন সংঘবদ্ধ হয়ে করে, তখন একটা ফোর্স হিসেবে কাজ করতে পারে। ফলে আমরা দেখেছি যে, তারা ছোট ছোট জিনিসগুলো করতে পারে, যেগুলো বৃহত্তর কাঠামো, ক্ষমতার কাঠামোকে ছুঁবে না। কারণ অবশ্যই বৃহত্তর ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে যদি তারা হাত দেয়, সেটা তাদের জন্য খুব একটা পজেটিভ হবে না। কারণ তাদেরকে যথেষ্ট শক্তির সঞ্চয় করতে হবে। এই শক্তি সঞ্চয় করার জন্য হয়তো সেতুবন্ধনগুলো দরকার আছে। যে নারীবান্ধব সংগঠনগুলো আছে, তারা এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তাদের নিজস্ব সার্কেলের মধ্যে তারা এই কাজগুলো করতে পারে এবং ছোট ছোট জিনিস যেমন— আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় যে নারীদের অনেক সময়, বিশেষ করে যারা দলিত নারী, তাদের নিজস্ব বাথরুম নাই, নিজেদের টয়লেট নাই। তো সেখানে তারা আবেদন করেছে মেয়রের কাছে যে তাদের একটা টয়লেট দরকার এবং সেই মেয়রের সাহায্যে তারা এই উদ্যোগটা নিতে পেরেছে। এইভাবে আমরা দেখি তারা একতাবদ্ধ না হলে, এই কাজগুলো সাধন করতে পারতো না। ফলে এই ধরনের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং একশনটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, নারী আন্দোলনের মধ্যে যদি শ্রেণিসম্পর্কগুলোকে সুদৃঢ় করতে হয়, এই ধরনের পদ্ধতিগুলো আমাদেরকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

যুক্ত আলোচনা

রাবেয়া রওশন (গবেষক): এই আলোচনা অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারী আন্দোলনে কারা যুক্ত আছে? নারীবাদী সংগঠন, শ্রম সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলে নারী অঙ্গসংগঠনগুলো মূলত এতে যুক্ত আছে। প্রত্যেকেরই এজেন্ডা ভিন্ন, আবার কোন কোন সময় সংহতিও হচ্ছে। কিন্তু মূলধারার নারীবাদী সংগঠন নিয়ে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। এখানে মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিক যুক্ততা থাকে। কিন্তু এসব নারীবাদী সংগঠনের কাজ বা আওয়াজ কতদূর পৌঁছায়? এসবের কার্যক্রম মূলত ঢাকা শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত (মহিলা পরিষদ ছাড়া)। বস্তির নারীদের কাছে কিন্তু এই আওয়াজ পৌঁছায় না। শ্রেণি এখানে একটা ইন্টারসেকশনাল ইস্যু, তাই বলা যায় যারা উপার্জন করে না এমন নারীরা এটা শুনতে পায় না। এক্ষেত্রে রিইব একশন রিসার্চ করছে। তাহলে এই নারী সংগঠনগুলোকে আমরা কী বলবো? এগুলোকে কী নারীবাদী সংগঠন বলবো, নাকি

দ্বৈত সত্ত্বা বলবো? ১৯৯৫ এর পর ‘মহিলা পরিষদ’, ‘নারীপক্ষ’ প্রভৃতি সংগঠন রাতারাতি এনজিও হয়ে যায়। এখন ‘দুর্বীর নেটওয়ার্কের’ মত সংগঠনগুলোকে আমরা নারীবাদী সংগঠন বলবো, নাকি এনজিও বলবো, কারণ দুর্বীর নেটওয়ার্কের সদস্যগুলো স্থানীয়ভাবে রেজিস্টার্ড এনজিও? এখানে নারীপক্ষ সেক্রেটারিয়েট হিসাবে কোন সত্ত্বায় কাজ করে? তারা কী নারীবাদী সংগঠন নাকি এনজিও? এনজিও না হলে দুর্বীরের জন্য টাকা পেতে পারে না। এছাড়া আমি আরও জানতে চাই, সত্যিই কি অন্যের টাকায় আন্দোলন হয়, নাকি কাজটা ডোনারের ডিম্যান্ড অনুযায়ী হয়?

মেঘনা গুহঠাকুরতা: নারী সংগঠনগুলো যে আদলেই কাজ করুক না কেন, তারা অবশ্যই নারী সংগঠন। বাস্তবতা হচ্ছে এনজিওকরণ হয়েছে, কিন্তু তারা এনজিও-র উর্ধ্বে। বাংলাদেশের প্রথম প্রহরে যে নারী সংগঠনগুলো বা ব্যক্তিত্ব ছিল, তারা শহুরে মধ্যবিত্ত হলেও, নারী প্রশ্নে যারা একটা মতাদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আমি তাদেরকে নারী সংগঠন বলবো। ১৯৯৫ থেকে তাদের টিকে থাকার যে আদল তৈরি হয়েছে, সেটা প্রতিটি সংগঠনের ক্ষেত্রেই ডোনার নির্ভরশীলতা হয়েছে। ডোনারের কাছ থেকে টাকা নেওয়া কোন অপরাধ নয়, কারণ বাংলাদেশে এটা বাস্তবতা। কিন্তু ডোনারের টাকার উপর নির্ভর করে আন্দোলন করা যায় না, এটা আমি মানি। ইস্যুগুলো অবশ্যই নিজস্ব হতে হবে। যেমন রিইব রেজিস্টার্ড এনজিও হলেও সার্ভিস ডেলিভারি দেয় না, বরং জ্ঞানভিত্তিক সংগঠন। প্রকল্প এলাকাতে প্রথমেই বলা হয় যে, আমরা কিছু দিই না এবং তাতে অর্ধেক মানুষ চলে যায়। এতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যারা থেকে যায়, তাদের সাথেই আমরা কাজ করি। আর কণ্ঠ অনুশীলনের ক্ষেত্রে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষীণ কণ্ঠগুলোর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা পার্টি হিসাবে পৌঁছাই না। যখন একটা সংগঠন হয়, তখন তার নেতৃত্ব এজেন্ডা ঠিক করে কিনা এবং এই নেতৃত্বের অবয়ব যাই হোক না কেন, এজেন্ডা প্রসারিত করছে কিনা? যাদের সমস্যা তারা আন্দোলনটার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা? নারী বা শ্রেণি বিষয়ে যতগুলো সত্যিকারের আন্দোলন হয়েছে, সেগুলো গ্রাউন্ড লেভেল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যেমন রামপালে সুন্দরবনের পাশের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনে স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ততা অতটা ছিল না, যতটা ছিল ফুলবাড়ীতে কয়লা খনি বিরোধী আন্দোলনে। সেখানে স্থানীয় জনগণের অস্তিত্বের ব্যাপার ছিল। আন্দোলন চাহিদা অনুযায়ী হয়, তাই আমরা মালিকানাটা ঐ মানুষদের দেওয়ার চেষ্টা করি। সফলতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, এটা একটা প্রক্রিয়া। এটা একটা সাংগঠনিক নীতির বিষয়। নেতৃত্বের প্রকারটা কী? নারী সংগঠনের এজেন্ডা সে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে? নাহলে যে আন্দোলন কেন্দ্রের মাধ্যমে সঞ্চালিত হচ্ছে সেখানে তাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকেই যাবে।

রাবেয়া রওশন: নারীবাদী সংগঠনগুলোর দ্বৈত সত্ত্বা আলাদা করা খুব প্রয়োজন। নাহলে টেকসই হবে না। আন্দোলনকে তো প্রকল্প হিসাবে দেখা যায় না। তাই এই দ্বৈত সত্ত্বা আলাদা না করতে পারায় কথা বলার জায়গা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫ এর পর থেকে মূল ধারার নারীবাদী আন্দোলন হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না।

ফরিদা আখতার (নির্বাহী পরিচালক, উবিনীগ): এ ধরনের আলোচনা অনেক হওয়া উচিত। এরকম আলোচনা হয়না বলে আমরা অনেক কিছু করেও দিকভ্রান্ত হচ্ছি। আমরা শ্রেণির দৃষ্টিকোণটাই ঠিক করতে পারিনি। নারী বলে তো একক কোন সত্ত্বা নাই। এর মধ্যে ধনী বা গরীব নারী আছে, কৃষক নারী, আদিবাসী নারী আছে। নারীবাদকে একসময় নারী বনাম পুরুষের বিরোধ হিসাবে দেখা হত। এখন পুঁজিবাদ পিতৃতান্ত্রিকতার সাথে মিলে আরও বড় পুরুষ হয়ে গেছে। রণজিত গুহের আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা গায়ত্রী স্পিডাককেও আনতে পারি। তিনি বছরে একবার হলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে গিয়ে সেখানকার মানুষের ভাষা শিখতে চান। ওদের ভাষাটা কী, ওরা কোন ভাষায় নিজেদের কথাটা বলতে চান। আমি যদি ঐ ভাষাটাই না জানি তাহলে তো হবে না। আমাদেরকেও ঐ ভাষাটা জানতে হবে। আমরা বলি যে আমরা কৃষক বা শ্রমিকের সাথে কাজ করছি, কিন্তু আমরা কী তাদের ভাষাটা জানি? আমার ভাষা কী সে বোঝে? আমি বললাম বীজের অধিকার, সেক্ষেত্রে অধিকার কথাটার অর্থ তো তার কাছে ভিন্ন হতে পারে। এই বিষয়গুলো আরও জোরেশোরে আলোচনা করা উচিত। আমি মনে করি, উন্নয়ন কথাটাই শ্রেণি বিবর্জিত। ফলে তারা মিলিটারির মত নারীকে টার্গেট করে। এর মাধ্যমে তারা পরিবার পরিকল্পনা, আধুনিক কৃষি, ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিজ এর টার্গেট করলো, কিন্তু উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারীর নিজস্ব সত্ত্বা বিকাশের কার্যক্রম দেখবে না। মধ্যবিত্ত নারী যখন কোন ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করে, বা কোন নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের ঘটনা হলে নারী সংগঠনগুলো যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কৃষক নারী যখন বীজ রক্ষার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে বা তার খাদ্য অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তখন কিন্তু নারী সংগঠনগুলোকে ডাকলেও আসবে না। তখন কৃষক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হয়। কর্পোরেশনগুলো বীজের মত পানির অধিকার নষ্ট করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে নারীবাদী হিসাবে পানি, বীজ বা জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিষয়গুলোতে আন্দোলনের প্রেক্ষিত এখনও তৈরি হয়নি। আমাদেরকে পরিবেশ সংগঠন করে নারীর কথা বলতে হবে। যেমন সুন্দরবন আন্দোলনের সময় নারী প্রশ্নটা কী ছিল, সেটা কিন্তু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি। এখন এলজিবিটি সামনে চলে আসছে। এটা দীর্ঘ আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ফল। অনেক ডোনাররা বাধ্য করছে এগুলো অন্তর্ভুক্ত

করতে। ডোনার বলতে কাকে বোঝায়? বিল গেটস ফাউন্ডেশনের মত ডোনারদের ক্ষেত্রে তাদের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করতে হয়। আমরা ডোনার বাছাই করতে পারি কিনা? যে কোন ডোনারের টাকা নেওয়া যাবে না। এভাবে টাকা না নিয়ে, হয়ত আমি গরীব থাকবো, কিন্তু মিলিয়ন ডলার দিলেও এজেন্ডা সেট করে দেয় এরকম টাকা নেওয়া যাবে না। আর দ্বৈত সত্ত্বার ক্ষেত্রে, বর্তমানে ভলান্টিরিজম কমে গেছে, এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোকেও চাঁদা তুলতে হয়। ফলে নারী সংগঠনগুলোকেও চলার জন্য টাকা নিতে হয়, এক্ষেত্রে আমরা যেন ডোনারদের খপ্পরে না পড়ি। এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া দরকার।

মেঘনা গুহঠাকুরতা: আমরা যখন ডাইভারসিটি বা ইনক্লুসিভিটির কথা বলি, তখন শ্রেণিকে নিয়ে আসি না। আদিবাসী নারীর মধ্যেও মধ্যবিত্ত-নিম্নপশিত শ্রেণি আছে। শ্রেণিও ডাইভারসিটির ব্যাপার, কিন্তু সেটা কখনও উচ্চারণও করা হয় না। এটা বললে ওন্ড ফ্যাশন বা সেকেন্ড হাণ্ড হয়ে যায়। এটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা দরকার। এক্ষেত্রে শ্রেণি কাঠামোর বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমস্যাগুলো তো বৈশ্বিক কাঠামোটাই করছে। বাংলাদেশের ধনী-গরীবের ব্যবধান বা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ দরকার। কৃষি বা শ্রমের মত বিষয়ভিত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা শ্রেণিগত ব্যাখ্যা ঠিকই নিয়ে আসছে, কিন্তু মূলধারার নারীবাদী আন্দোলন এগুলো কতটা ধরতে পারছে? এ নিয়ে আমাদেরও প্রশ্ন আছে।

বিনোদ কষ্টি (প্রজেক্ট ম্যানেজার, রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং- সাউথ এশিয়া অফিস): রিইব নারী কৃষকদের ৫০ ধরনের কাজ চিহ্নিত করেছে। এছাড়া কৃষিতে তাদের অবদান কিভাবে সুদৃঢ় করা যায়?

মেঘনা গুহঠাকুরতা: নারী সর্বদা কৃষিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তার স্বীকৃতি দেয় না। ১৯৮০ থেকে যেসব লেখালেখি ও কাজ হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে এগুলো আমাদের সামনে এসেছে। এখন সমস্যাটা শুধু পিতৃতান্ত্রিকতার বিষয় থাকছে না, এখানে ধনতান্ত্রিক একটা ব্যাপারও আছে। কর্পোরেট স্বার্থের সাথে যারা আছে, তারা যে শুধু নারীর কাজকে অস্বীকার করে এমন না, তাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা নারীর সম্পৃক্ত কাজগুলো, সেগুলোও তাদের কাছে থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা আজন্ম জানি, আমাদের সাহিত্যে আছে, নারীরা বীজ সংরক্ষণ করে। নারীরা যদি বীজ সংরক্ষণ করতে অপারগ হয় বা অস্বীকার করে, আর কর্পোরেট গোষ্ঠী বীজ নিয়ে হাজির হয়, তাহলে এটা নারীকেই অধিক আঘাত করবে। সমাজে নারীর অবদানে এটা প্রভাব ফেলবে। তাহলে এটাকে শুধু নারী প্রশ্ন হিসাবে ধরবো না। রিইব এর নারী ও পুরুষ কৃষকদের গবেষণার আলোচনায়

এটা চলে আসে, এটা সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। একটা দেশকে আক্রমণ করলে দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যায়। বা কোন দেশের উপর অন্য দেশ কোন পলিসি চাপিয়ে দিলে সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের কৃষকের বা শ্রমজীবী মানুষের কাজগুলোর সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক বা কৃষকরা তার শ্রমটাকে নিজের (own) করতে পারছে না। আর একই সংগঠন যদি আবার বলে যে, নারী নিয়ে কাজ করো, তাহলে কিছুটা এসডিজি-র মত অবস্থা, যে একটা নিওলিবারেল ইকোনমির মধ্যে আমি শোষণ করছি, আমি তাদের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছি। আবার একটা নারী প্রোথ্রাম করে তথাকথিতভাবে তাদেরকে স্পেস দিচ্ছি যাতে তারা আন্দোলন না করে সুষ্ঠুভাবে গুছিয়ে তাদের ক্ষোভ বা রাগ প্রকাশ করতে পারে। এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এ ধরনের পরিস্থিতি আমি এভাবেই বিশ্লেষণ করি। আমাদের একটা জায়গা দিয়েছে অভিযোগ জানানোর। কাউকে পেছনে রাখা যাবে না— এই কথাগুলোর মাধ্যমে। এতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে বাঁপিয়ে পড়েছে। আগে আমরা দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করতাম, আমরা এ ধরনের কোন শ্লোগান দিইনি, কারণ আমরা কাজ করতাম। এসব জনগোষ্ঠী আমাদের বলেছিল যে, এ কাজগুলো করা দরকার। এখন যদি এখানে টাকা আসে, তার জন্য আমি যদি এই কাজগুলো করি, তাহলে এই ফাঁকটা কী আদৌ পূরণ হবে? এটা তো পূরণ হওয়ার নয়। টাকা ব্যবহার হবে, কিন্তু আন্দোলনও তখন একটা পুঁজিবাদী আকাজক্ষা বা ডিজায়ার পূরণ করবে, স্তিমিত হবে। শাহবাগ বা কিশোরদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মত কিছু ঘটবে না। সব কিছু সুষ্ঠুভাবে হবে, আগে থেকেই অনুমান করা যাবে আন্দোলন কতটুকু অগ্রসর হবে, বা চ্যানেলাইজ করা যাবে। এগুলো নিয়ে আমাদের নিজেদের চিন্তা করা দরকার। এই প্রেক্ষিত থেকেই আমি নারীবাদ, আন্দোলন, নেতৃত্ব ইত্যাদির কথা বলেছি।

বিনোদ কপ্তি: তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব বিকাশের ব্যাপারে কাজ করতে হবে। নারীরা যেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং বিভিন্ন পরিসরে পিতৃতান্ত্রিকতার জায়গাগুলো আয়ত্ত করতে পারে।

রাবেয়া রওশন: সবজির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অনেক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সবজি চাষ থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই অধিকাংশ কাজ নারীরাই করে। পুরুষরা সাধারণত বাজারে বিক্রি করে এবং বিক্রিলব্ধ টাকাটা তার কাছে থাকে। অর্থাৎ নারীদের শ্রম পুরোটাই দিতে হয়, কিন্তু তাদের সম্পদ ও অর্থে প্রবেশাধিকার নেই, নিয়ন্ত্রণ থাকার তো প্রশ্নই আসে না। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার সময় নারী কৃষক খুঁজে পায় না। দেখা যায় শতকরা ২/৩ জন নারী কৃষকের আওতায় জমি আছে, যারা তাদের

বাবার বাড়ি থেকে বা অন্যভাবে জমিটা পেয়েছে। কৃষিতে নারীর এত অবদান থাকার পরও সরকারি-বেসরকারি-সামাজিক কোন পক্ষই কৃষক বলতে নারী বুঝে না। এটা কেন? এই বিষয়ে রিইব এর অভিমত কী?

সুরাইয়া বেগম: নারীদের শ্রমটা হচ্ছে অদৃশ্য, সেটা জিডিপিতে ধরা হয় না। গবেষণায় দেখা গেছে নারীদের কাজ কাউন্ট করলে তা জিডিপির ৮-৭% ভাগ হত। কিন্তু যেহেতু এটা অদৃশ্য, ফলে পরিসংখ্যানের হিসাবে এটা ২০% ভাগ। এখন পর্যন্ত কৃষক হিসাবে নারীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এটা মূলত জমির মালিকানার কারণে। কৃষক মানে তার জমি থাকবে, নিজস্ব বা বর্গা/লিজের মাধ্যমে জমি। গ্রামাঞ্চলে ৮-১% ভাগ কৃষিজমি পুরুষের নামে। এর সাথে পলিসিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা কারণ আছে। এগুলো মূলত নারীদের কৃষক হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার পেছনে কাজ করে। এসব বিষয়ে আরও সোচ্চার হতে হবে। এছাড়া এখানে ক্ষমতা, পিতৃতান্ত্রিকতা ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক আছে। এগুলো নিয়ে আরও আলোচনা হলে পরিবর্তন হতে পারে।

মাহতাব উদ্দিন: সিডও সনদ যে বৈষম্যের কথা বলে, তা কতটা শ্রেণি বৈষম্যকে স্পর্শ করে? এখানে লিঙ্গ সমতার কথা বলা হয়, কিন্তু এটা কি ভিন্ন লিঙ্গের কথা বলে?

মেঘনা গুহঠাকুরতা: নারী-পুরুষের সমতা একেক সমাজে একেক রকম। পশ্চিমা দেশে যে ধরনের ইতিহাস আছে সেটা পৃথিবীর অন্য জায়গায় একই রকম নয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বদলে যায়। আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ডেমোক্রটদেরই বাম বলা হত, অথচ তারা রিপাবলিকদের মতই পুঁজিবাদী। ফলে একেক জায়গায় একেক প্রপঞ্চ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জাতিসংঘ বললে আমরা এটা মেনে নিই। কিন্তু এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে যে, এগুলো আসলে আমাদের সমাজের সাথে মিলে কিনা? আবার আমাদের সমাজের মধ্যেও পুরুষ ও নারীর সামাজিক অবস্থান ভিন্ন। এখানে অন্য জেভারের সমতার প্রশ্ন তো আরও ভিন্ন আলাপ; এগুলো এখন উত্থাপিত হচ্ছে। ভিন্ন জেভারের আন্দোলন হচ্ছে এবং তারা মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এসব আন্দোলনের দাবিগুলো আমরাও কতটুকু মানতে পারব, সেটাও একটা প্রশ্ন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমতাকে দেখার যে প্রশ্নগুলো আমরা তুলছি, সেভাবেই আমাদেরকে ভিন্নতার চোখে দেখতে হবে। সিডও নিয়ে এসব প্রশ্ন তুলতে হবে এবং তাহলেই আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা জায়গায় পৌছাতে পারি।

সুরাইয়া বেগম: নারীর প্রতি সহিংসতা একটা বড় ইস্যু, যা সকল শ্রেণির নারীর প্রতি ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে শ্রেণি সম্পর্ক কিভাবে কাজ করে? এছাড়া আপনি বলেছেন যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর জন্য যেসব কর্মসূচী আছে সেগুলো শ্রেণি

বিবর্জিত, এটা একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হত। আর নারী নীতির মধ্যে শ্রেণি সম্পর্ক কিভাবে নিয়ে আসা যায়?

মেঘনা গুহঠাকুরতা: র্যাডিকাল নারীবাদীদের মতে, নারীরা নারী হিসেবেই নিগূহিত হয়। আমাদের সমাজেও ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র-আদিবাসী সকল নারীই নিগূহিত হয়। বিশেষত বাংলাদেশে ডমিস্টিক ভায়োলেন্স ব্যাপক হারে ঘটে থাকে। ফলে সকল শ্রেণির নারীই অনেক বেশী অনিরাপত্তায় ভুগে। এখানে কী তাহলে শ্রেণি সম্পর্ক আসবে না? আসবে, কারণ নারীরা ভুক্তভোগী, কিন্তু এক্ষেত্রে অপরাধী কারা? এটা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে। সব পুরুষই কি অপরাধী বা সব শ্রেণির পুরুষই কী অপরাধী? আসলে কী হচ্ছে, সেটা দেখতে হবে। মুনিয়া আক্তার, গণধর্ষণ, কল্পনা চাকমা প্রভৃতি ঘটনাগুলো রাষ্ট্রীয় আদলের মধ্যে একটা মেকানিজমের দ্বারা হয়েছে, যেগুলো নারীদেরকে নিগূহিত করে। এগুলো খুব সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা না করলে এবং শ্রেণি ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে দিলে, তাহলে আমাদের বলাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শ্রেণি বিবর্জিত হলে নারীদের সহিংসতা থেকে আমরা এগোতে পারবো না। কারণ বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধরনের শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, যেখানে একজন নারী নিরাপদ বোধ করছে না। তাহলে এটা যাদের হাতে মোবাইল আছে অর্থাৎ শহুরে মধ্যবিত্তদের ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু এটা শুধু মধ্যবিত্তদের ব্যাপার নয়। একটা জরিপে বলা হয়েছে, সাইবার বুলিং বা যৌন হয়রানি গ্রামে অনেক বেশী, কারণ এখানে জ্ঞানের একটা গ্যাপ আছে। শহরে থাকলে প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার বেশী। এছাড়া পরিবার বা বন্ধুদের থেকে এসব বিষয় মোকাবেলার কৌশল জানা যায়। কিন্তু গ্রামের একটি মেয়ে কিন্তু এই নিরাপত্তা কৌশল জানে না। কোন ধরনের ছেলেরা এসব করছে, এই শ্রেণি বিশ্লেষণটা খুব দরকার বলে আমি মনে করি। নাহলে পর্নোগ্রাফির দিকে যে ঝাঁক, যেটা আগের চাইতে অনেক বেশী হচ্ছে, এগুলোর অপরাধী কারা সেটা আমরা বুঝতে পারবো না। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শ্রেণি বিশ্লেষণটা করতে হবে। অর্থাৎ এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা কারা এবং কিভাবে সৃষ্টি করছে এটা বুঝতে হবে। এটা সহিংসতার ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে আমি বললাম।

আর অন্য প্রশ্নটির ব্যাপারে বলা যায়, বাংলাদেশ সরকার এক ধরনের উন্নয়ন চাচ্ছে এবং সেটা পুঁজিবাদী আদলের উন্নয়ন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নারী নিয়ে কথাবার্তা বলা শ্রেণি বিবর্জিতই হবে আমি মনে করি। কিন্তু আমরা যারা এ ধরনের এজেন্ডায় অংশগ্রহণ করবো, তাদের উচিত শ্রেণি বিশ্লেষণ নিয়ে আসা, যাতে তৃণমূল পর্যায়ে এ ধরনের অবস্থা মোকাবেলা করা যায়। অর্থাৎ নারীনীতির মধ্যে কিভাবে এগুলো প্রতিফলিত করতে হবে, আমরা আদৌ এ ধরনের হোম ওয়ার্ক করিনি। আসুন আমরা নারী নীতিমালার মধ্যে শ্রেণি বিশ্লেষণগুলো কিভাবে

নিয়ে আসতে পারি সেটা আলোচনা করি। যেখানে যেখানে শ্রেণি বিশ্লেষণ আসছে, যেমন কৃষক নারী বা শ্রম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, সেগুলো আমরা নারী নীতিমালায় রূপান্তরিত করতে পারি কিনা, সেই প্রশ্নটা আমি করবো। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রসঙ্গেও শ্রেণি বিশ্লেষণ করা হবে।

মতিউর রহমান (প্রোথাম ম্যানেজার, রিইব, নীলফামারী): নারীদের কাজ সবসময় অবমূল্যায়িত হয়। নারীদের কাজ মূল্যায়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

মেঘনা গুহঠাকুরতা: এখানে বিশেষ করে বিনা বেতনে পরিচর্যাকারী (আনপেইড কেয়ার ওয়ার্ক) কথা বলা হয়েছে। এগুলো নিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে। সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যাতে আনপেইড কেয়ার ওয়ার্ক জিডিপির মধ্যে নিয়ে আসা হয়। সরকার একটা জরিপ করার পদক্ষেপ নিবে এরকম শুনেছিলাম। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে জরিপটা হলে এই কথাগুলো তুলে ধরা সহজতর হবে।

এম এম আকাশ (অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়): শ্রেণি প্রশ্নে প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে সম্পদের উপর মালিকানার প্রশ্ন। সুতরাং নারীবাদীরা যদি নারীর মালিকানার ক্ষেত্রে যেসব বৈষম্য আছে সেগুলো পরিবর্তনের জন্য একটা আন্দোলন করতে পারে, যেমনটি ‘মহিলা পরিষদ’ শুরু করেছিল ‘ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড’ নাম দিয়ে, তাহলে শ্রেণি প্রশ্নটা ধীরে ধীরে সামনে চলে আসবে। এটা একই সঙ্গে শ্রেণিরও প্রশ্ন, আবার নারীরও প্রশ্ন এবং একটা সিনথেসিস আছে।

চৈতন্য কুমার দাস (গবেষণা সহকারী, রিইব, সাতক্ষীরা): ইউনিয়ন পরিষদের যে সংরক্ষিত নারী সদস্য আছেন, তারা ৩টি ওয়ার্ডের দায়িত্বে আছেন। ফলে উনাদের মতে সীমিত বরাদ্দ ও সামর্থ্য দিয়ে তাদেরকে ৩টি ওয়ার্ডের মোকাবেলা করতে হয়, যা তাদেরকে আরেক ধরনের বিভ্রম্নায় ফেলে দিয়েছে।

মেঘনা গুহঠাকুরতা: এ ধরনের অভিযোগ আমরাও শুনেছি। লেখালেখির মধ্যে আসলেও এই ইস্যুটাকে নারী আন্দোলনের ইস্যু হিসাবে রূপ নিতে দেখিনি। আমার মনে হয়, নারী সংগঠনগুলো যদি তাদের এজেন্ডায় এই ইস্যুটাকে তুলে তাহলে সামনে এগোনো যাবে। এছাড়া এ ধরনের তথ্যগুলো শেয়ার করা উচিত, কারণ আমি এরকম একটি মামলার কথা শুনেছি। রাষ্ট্র এরকম নানা বিভ্রম্নায় ফেলতে চাইবে, তাই সংশ্লিষ্টদের এ ধরনের তথ্য শেয়ার ও আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

আনোয়ার হোসেন (গবেষণা সহকারী, রিইব, বগুড়া): কিছুদিন আগে কৃষি শ্রমিক বিষয়ক গবেষণার জরিপ করার সময় নারী শ্রমিকরা আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে,

পুরুষের তুলনায় যে নারীর মজুরি কম, এক্ষেত্রে কী করা যায়? কারণ তারা প্রতিবাদ করলে তাদেরকে কাজ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

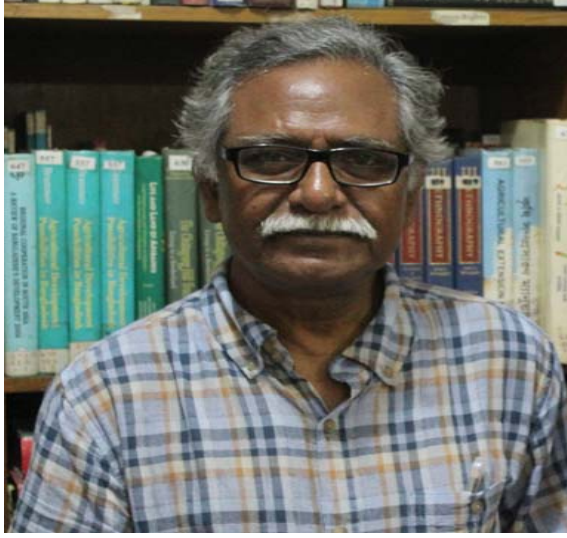
মেঘনা গুহঠাকুরতা: এরকম অভিযোগ দেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তারা নিজেরা কী করতে চায়, তাদেরকে এ ধরনের চর্চায় আসতে হবে। তারা মালিকের সাথে দর কষাকষিতে যাবে, নাকি কী করবে সেই সিদ্ধান্ত তাদেরকেই নিতে হবে।

চৈতন্য কুমার দাস: এক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ সহ নানা বিষয় জড়িত। এক্ষেত্রে নারীদের সংঘবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরী। দেখা যায় যে, এক গ্রামে হলে অন্য গ্রাম আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে মালিকের কাছ থেকে কাজ নিয়ে নেয়। ফলে সংঘবদ্ধ হওয়া জরুরী, এর পাশাপাশি পুরুষ শ্রমিকদের সহযোগিতাও দরকার।

চতুর্থ দিন : ২৩ আগস্ট ২০২৩

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক ও শ্রমিকের প্রেক্ষিত

সুরাইয়া বেগম: রিইব কাজ করছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষি প্রতিবেশ নিয়ে এবং এ বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করার কাজ করছে। যাতে কৃষক সমাজে, রাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিকতায় তথা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তার অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে জানতে পারে এবং সচেতন হতে সমর্থ হয় এবং সেই পরিসরে তার জীবন পরিচালনা করতে পারে। এটা খুব সহজ কাজ নয়। তাদের চেতনার প্রসারে গণগবেষণা বা Participatory Action Research (PAR) তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এই কাজ করতে গিয়ে কৃষি মজুর, শ্রেণি সম্পর্ক, ভূমি সংস্কার, রাষ্ট্রের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, নয়া উদারতাবাদ-এর ভূমিকা এসব বিষয়ে জ্ঞান চর্চা করা ও কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেবার কাজ করতে হচ্ছে। রিইব এই কাজে সেমিনার, স্কুল, ডায়ালগ, প্রকাশনা এবং বিষয়ভিত্তিক ওয়েবিনার অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে সাধারণের মাঝে জ্ঞানের প্রসারে। গত তিনদিন ধরে যে আলোচনা হচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় আজ আলোচনা করবেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর বলবার বিষয় “বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক ও শ্রমিকের প্রেক্ষিত”।



আনু মুহাম্মদ

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: কৃষক ও শ্রমিকের প্রেক্ষিত

আনু মুহাম্মদ : বাংলাদেশের সমাজে শ্রেণি কিভাবে তৈরি হচ্ছে, ভাঙছে, রাষ্ট্রের নীতি এবং সমাজবিন্যাসের ক্ষেত্রে তার প্রভাব কেমন; বর্তমানে শোষণ, নিপীড়ন কিংবা আধিপত্যবিরোধী কোনো চেষ্টা আছে কিনা, এগুলো নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। শ্রেণি সম্পর্ক বা শ্রেণির গঠন এটা কোনো স্থায়ী বিষয় না। শাস্ত্রত শ্রেণি বা শ্রেণি সম্পর্ক বলে কিছু নাই। এটা সবসময় একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। আর সেই পরিবর্তনের পেছনে ভেতরের কারণ থাকে, আভ্যন্তরীণ কারণ থাকে, আবার বহিঃস্থ কারণও থাকে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় আমরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দেখেছি। তারপরে আমরা দেখি একটা জমিদার শ্রেণি, যাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে উদ্ভব ঘটেছিল এবং সেই জমিদারি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরা সবাই মোটামুটি খাজনাভোগী শ্রেণি। এর পাশাপাশি কোম্পানির সাথে সম্পর্কিতভাবে একটা ব্যবসায়ীক শ্রেণি তৈরি হয়েছিল।

আর ছিল রায়ত- একটা বিশাল জনগোষ্ঠী যারা কৃষক, যাদের খুবই অনিশ্চিত জীবন ছিল। এই কাঠামোও আস্তে আস্তে বিভিন্নভাবে সূর্যাস্ত আইন, বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ উপাদান এবং কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হলো। দীর্ঘ আন্দোলনের কারণে পাকিস্তান আমলে এই জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হয়ে যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রকে প্রায়-ঔপনিবেশিক একটা রাষ্ট্র বলা যায়। সেই রাষ্ট্রে শক্তিশালী জোতদার শ্রেণি দেখি আমরা। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীক গোষ্ঠী সেভাবে শক্তিশালী ছিল না। কিছু ছিল, কিন্তু জোতদারই ছিল প্রধান শ্রেণি। এছাড়া গ্রামীণ সমাজে বর্গাদার ছোট কৃষক ছিল। শহরাঞ্চলে ষাটের দশক থেকে একটা মধ্যবিত্তশ্রেণি তৈরি হয়ে গেলো যারা পেশাজীবী, উকিল কিংবা শিক্ষক। আর শ্রমিকশ্রেণিও সেসময় তৈরি হতে থাকে। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বেশ কিছু কারখানা তৈরি হয়, যেমন পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প। সেখানে একটা শ্রমিকশ্রেণি তৈরি হয়। এইটা নিয়েই আমাদের বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। সেই জোতদার শ্রেণি, কারখানার শ্রমিক এবং পেশাজীবী, ছোট ব্যবসায়ী যারা তৈরি হয়, তাদের দিয়েই আমাদের বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। যেটাকে অনেকে বলে ইন্টারমিডিয়েট রিজিম, একটা অন্তর্বর্তীকালীন স্টুট।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে এই শ্রেণি কাঠামোর মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়। কারণ বাংলাদেশের বাঙালি মধ্যবিত্ত প্রথম রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ, বিদেশী ঋণ, আন্তর্জাতিক সংস্থা- এগুলোর মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে একটা ভাঙন এবং নতুন ধরনের বিন্যাস শুরু হয়। গত কয়েক দশকে অনেক ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। এই কয়েক দশকে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এখনকার যে পরিস্থিতি, সেটার দিকে আমি প্রধান মনোযোগটা দিতে চাই।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের যে শ্রেণিকাঠামো, সেখানে একটা বড় ধনীকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে এদের অস্তিত্ব ছিল না এবং প্রথম দুই-তিন দশকেও এদের তেমন দাপট দেখা যায় নাই। এখন এই শ্রেণিটা খুবই সংহত, সংগঠিত এবং শক্তিশালী। আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তানের ২২ পরিবারের সাথে লড়াই করেছি। বাংলাদেশে এখন যদি আমরা ধনীক পরিবারের মধ্যে প্রথম ২২ পরিবারকে

শনাক্ত করি, তাহলে দেখব যে সম্পদের দিক থেকে, ক্ষমতার দিক থেকে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের দিক থেকে, তারা অনেক বেশি শক্তিশালী।

বেশ কয়েকটা ব্যবসায়িক গোষ্ঠী বাংলাদেশের অনেকগুলো খাত নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর মধ্যে ব্যাংক মালিক, গার্মেন্টস এর মালিক, আমদানি-রপ্তানি, পরিবহন ও অন্যান্য ক্ষেত্র যারা নিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের বিরাট প্রভাব আছে। এই শ্রেণির মধ্যে আমরা কয়েকটা গ্রুপের নাম বলতে পারি, যেমন এখন প্রথম ২২ পরিবারের মধ্যে রয়েছে বেব্লিমকো, বসুন্ধরা, ইউনাইটেড, সামিট, ওরিয়ন, এস আলম প্রভৃতি। এরা বিপুল প্রভাবশালী, এদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এখন অনেক সম্প্রসারিত। এই ধনীক শ্রেণির মধ্যে শ্রেণি ঐক্য আগের অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। যেমন কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের নাম বলতে পারি যারা এই শ্রেণি ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যেমন- বিজিএমইএ, গার্মেন্টস মালিকদের একটা সংগঠন। এছাড়া আছে বিকেএমইএ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানারকম টানা পোড়েন আছে, সংঘাত আছে, কিন্তু এদের মধ্যে কোনো সংঘাত নাই। শ্রেণিবদ্ধভাবে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং সেটাকে সম্প্রসারণের জন্য তারা বদ্ধপরিকর। এছাড়া আরও আছে ব্যাংক এসোসিয়েশন। বাংলাদেশে প্রাইভেট ব্যাংকের সংখ্যা পাবলিক ব্যাংকের চাইতে অনেক বেশি। এই প্রাইভেট ব্যাংকগুলো ব্যাংক ক্যাপিটালের মধ্য দিয়ে ধনীক শ্রেণি গঠন করে। ঋণ খেলাপী কিংবা ঋণ জালিয়াতি হচ্ছে সম্পদ আহরণ এবং বর্ধনের অন্যতম উৎস। এই ব্যাংক এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটা শক্তিশালী জায়গা যেখানে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকরাও সম্পৃক্ত; যেমন যারা গার্মেন্টস মালিক, তারাই আবার কেউ কেউ ব্যাংকেরও মালিক। বাংলাদেশে আরও একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা। বাংলাদেশের জিডিপিতে এখন কন্সট্রাকশন হচ্ছে খুবই বড় একটা কেন্দ্র। সেই কন্সট্রাকশনের সাথে সম্পর্কিত ডেভেলপাররা হচ্ছে একটা শক্তিশালী সংঘ। এই তিনটা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশের ধনীক শ্রেণির তিনটা বড় সংঘ যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর পাশাপাশি আমরা দেখব, যাদের প্রকাশ্য সমিতি নাই কিন্তু খুব শক্তিশালী সংঘ এরকম হচ্ছে এনার্জি সেক্টরের যেসব বিনিয়োগকারী আছে। এলপিজি, এলএনজি, কয়লা ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগ আছে। এদের মধ্যেও আবার ওভারল্যাপিং দেখা যাবে। কেউ ব্যাংকের মালিক, কেউ গার্মেন্টেসের

মালিক, কেউ এলপিজি বা এলএনজি-র ব্যবসা করেছে বা কয়লা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সাপ্লাই দিচ্ছে। তারা আবার সিমেন্ট কারখানা, রড কারখানা, কন্সট্রাকশনে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া তারা আবার পারমানবিক বিদ্যুৎ বা কয়লা বিদ্যুৎ, বা কুইক রেন্টাল প্রভৃতি প্রকল্পের সাথে যুক্ত। এই ধনীক শ্রেণি খুবই শক্তিশালী ও সংহত অবস্থায় আছে। বর্তমান রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাই হচ্ছে নির্ধারক। এদের সাথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগটাও এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি।

বাংলাদেশে ভারতের পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে, চীনের পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে, রাশিয়ার পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। এই যে আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ, এখানে এনার্জি সেক্টর আছে, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন কিংবা ইকোনোমিক জোন সেগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। কন্সট্রাকশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেই বিনিয়োগ, সেসব বিনিয়োগের মধ্যে লোকাল পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশের এই ধনীক শ্রেণি প্রতিনিধিত্ব করেছে। ধনীক শ্রেণির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এখন অনেক বেশি। বর্তমান সময়ে পুঁজিপতি শ্রেণি শুধু একটা দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা আসলে ট্রান্সন্যাশনাল এবং তাদের ইন্টারেস্টগুলোও আসলে ট্রান্সন্যাশনাল। তারা বাংলাদেশে বাস করে, বাংলাদেশ থেকে সে ক্যাপিটাল একুমুলেট করে, কিন্তু তার যোগসূত্রটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। এরকম একটা ধনীক শ্রেণি এখন তৈরি হচ্ছে।

এই ধনীক শ্রেণি গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে অনেকগুলো পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বাংলাদেশে শ্রমিক শ্রেণির সম্পদ আহরণ হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকারখানা ও ব্যাংকের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কারখানার শ্রমিকরাই ছিলেন প্রধান কারখানা শ্রমিক বা শিল্প শ্রমিক। এটা ভেঙে যায়। বিশ্বব্যাংকের স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশের পুঁজিপতিদের আকাজক্ষা ও আগ্রাসনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমে দুর্বল হয়ে প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়। সম্প্রতি প্রায় ২৬টা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকল বন্ধ হয়ে গেলো। ধনীক শ্রেণির নজর এসবের জমির দিকে। তারা সেটা দখল করতে চায় এবং রাষ্ট্রের সহায়তায় সম্পদ দ্রুত কেন্দ্রীভবন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল

এবং তাদের বাসস্থান, চিকিৎসা ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল অবস্থান ছিল। ৮০'র দশক থেকে নতুন পর্বের কারখানা তৈরি হল, যেমন গার্মেন্টস। সেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বাসস্থান, চিকিৎসা, সন্তানের জন্য স্কুল— এই সমস্ত কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ৮০'র দশকের পর থেকে নারী শ্রমিকের আবির্ভাবের মাধ্যমে তাদের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। এই মুহূর্তে নারী শ্রমিকদের বাংলাদেশের একটা নতুন সামাজিক শক্তি বলা যায়। আগে আমরা শ্রমিক বলতে বুঝতাম শুধু পুরুষ, কিন্তু এখন আর শ্রমিক বলতে শুধু পুরুষদেরকে বোঝায় না। এখন শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে নারী এবং গার্মেন্টসে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ নারী। শ্রমিকদের আরেকটা অংশ আমাদের চোখের সামনে আসে না, তাদের অবদান সবসময়ই আমাদের ভোগের ঝুড়িতে থাকে। তারা হচ্ছে চা-শ্রমিক। চা শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশই নারী এবং তাদের অবস্থা সবচাইতে খারাপ।

গার্মেন্টস এদেশের সবচেয়ে বিকাশমান খাত এবং গার্মেন্টস শিল্পের রঙানি আয় ক্রমে বাড়ছে। কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের অবস্থা কী? গার্মেন্টস ছাড়াও আরো যেসব শিল্প কারখানা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় সবগুলোতেই নানারকম শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তার সমস্যা আছে। সেই শ্রমিকরা জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প এবং ক্ষুদ্র বহুধরনের শিল্প কারখানায় কাজ করে। সেখানে শিশু শ্রমিক আছে, নারী শ্রমিক আছে, পুরুষ শ্রমিক আছে। কারখানাগুলোর মধ্যে গার্মেন্টসে সবচেয়ে বেশি কর্মযজ্ঞ আছে। সেই গার্মেন্টসেই দেখা যায় শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি, বকেয়া মজুরি, ন্যূনতম মজুরি পরিস্থিতি— এর সবই একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

বাংলাদেশের জিডিপি অনেক বাড়ছে, বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশকে এখন রোল মডেল বলা হচ্ছে। সেটার সাথে শ্রমিকদের যে মজুরি (গার্মেন্টসে ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা) সেটা কোনোভাবেই মিলে না। এর পাশাপাশি অন্যান্য যেসব শ্রমিক আছে, তাদের মধ্যে নির্মাণ শ্রমিক একটা বড় অংশ এবং তাদের আকার আরো বাড়ছে। কারণ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়ছে। এখন রাষ্ট্রের নীতিতেই নির্মাণ রয়েছে, অর্থাৎ এখন রাস্তাঘাট কিংবা ভবন নির্মাণের মহাযজ্ঞ চলছে। সেখানে রাষ্ট্রের ব্যয় বেশি, আবার ব্যক্তিগত বিনিয়োগও বেশি। এজন্য আবার বাংলাদেশে অনেক কৃষিজমি শেষ হয়ে যাচ্ছে। কৃষি

এবং গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যেও সেটার প্রভাব পড়েছে। গ্রামে কস্ট্রাকশনের সাথে সম্পর্কিত ইটের ভাটা অনেক বেড়েছে এবং ইটভাটার শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ছে। আবার ইটভাটার কারণে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির উপরেও সেটার প্রভাব পড়ছে। ইটের ভাটার শ্রমিকরা বাঁধা শ্রমিক বা বন্ডেড লেবারের মতো। তাদেরকে ধরে আনা হয়, তাদেরকে আটকে রাখা হয় এবং তাদের মজুরির কোনো ঠিক নাই। সেখানে অনিয়ম অনেক বেশি। কারণ বেশিরভাগ ইটের ভাটাই বেআইনি। বাংলাদেশে সরকারের হিসেবে শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি ইটের ভাটা হচ্ছে বেআইনি। এখানে যেসব শ্রমিকরা আছে তাদের নিরাপত্তা দেখার তাই কেউই নাই।

গার্মেন্টস দেশবিদেশের সবচাইতে বেশি মনোযোগের জায়গা, তারপরও সেখানেই শ্রম পরিদর্শনের কোনো সুফল আমরা পাই না। রানা প্লাজা ভবন ধ্বংসে সহস্রাধিক শ্রমিক মৃত্যুর পরও পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। দুই বছর আগে হাশেম ফুডস-এ আগুনে পুড়ে ৫৪ জন শ্রমিক নিহত হলো এবং মারা যাওয়ার পর জানা গেলো যে সেখানে শিশু শ্রমিকই বেশি ছিল। এই শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ কিংবা মজুরি নিয়ে মালিকরা কোনো দায়িত্ব নেয় না। কারণ তারা তো তাদেরকে নিয়োগ দেয়নি। এদেরকে ঠিকাদাররা সাপ্লাই দিয়েছে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির একটি বিশেষ দিক। এখানে ঠিকাদাররা সাপ্লাই দিচ্ছে শ্রমিকদের এবং শ্রমিকদের সাথে নিয়োগকর্তার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নাই। আর ঠিকাদাররা বলছে আমরা তো কেবল সাপ্লাই দিয়েছি, আমরা কিছু জানিনা। নিয়ম হচ্ছে, শ্রমিকরা যেখানে কাজ করবে সেখানে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে, নিয়মকানুন থাকবে, মজুরি নিয়ে দরকষাকষি হবে এবং অধিকার নিয়ে তারা লড়াই করবে। এই জায়গাগুলো এখন একটা ধোঁয়াশার মতো অবস্থার মধ্যে পড়েছে।

এর বাইরে আছে পরিবহন শ্রমিক। পুরো দেশে সব ধরনের ট্রান্সপোর্টের সংখ্যা বেড়েছে। বাসের সংখ্যা বেড়েছে, লঞ্চের সংখ্যা বেড়েছে। বাংলাদেশের মানুষের মবিলিটি বেড়েছে। আমাদের দেশ খুবই ছোট। এর মধ্যে গ্রাম থেকে শহরে মাইগ্রেশন, শহর থেকে আবার দেশের বাইরে মাইগ্রেশন হচ্ছে, অর্থাৎ মাইগ্রেশন বেড়েছে অনেক বেশি। মানুষ প্রচুর স্থানান্তর করেছে। কারণ দেশের অর্থনীতি দ্রুত আগাচ্ছে বলে আমরা শুনি, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে তার কোনো প্রতিফলন নাই।

আমরা একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে আছি। আমাদের শিক্ষার ব্যয় বেড়েছে, চিকিৎসার ব্যয় বেড়েছে। এগুলোর ব্যয় লাফিয়ে বাড়ার কারণ হচ্ছে এখানে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ অনেক বেশি। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এর যে কর্মসূচী, সেটা বাংলাদেশের ধনীক শ্রেণির জন্য খুবই সুবিধাজনক। তাদের পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষা, চিকিৎসা সবই এখন মুনাফাকেন্দ্রীক। তার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে। ব্যয় যেভাবে বেড়েছে, আয় সেভাবে বাড়েনি, মানুষের কর্মক্ষেত্রের নিশ্চয়তাও নাই। সেজন্য তার মধ্যে একটা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। অস্থিরতা থাকার কারণে সে সারাক্ষণ নতুন নতুন কাজের জায়গা খুঁজছে। এতে তার মবিলিটিটা খুব বেশি, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। গ্রামের যারা কৃষক বা মজুর, তারা কাজের জন্য কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিক নাই। বছরের সব সময়ই তাকে সচলতার মধ্যে থাকতে হয়। গ্রাম থেকে থানা শহরে যাচ্ছে, বা অন্য কোনো শহরে যাচ্ছে, বা ঢাকা শহরে আসার চেষ্টা করছে। ঢাকা শহরে বা অন্য কোনো শহরে কোনো একটা কাজ করার, বসার চেষ্টা করছে। যারা কিছু একটা লেখাপড়া জানে তারাও ঢাকায় আসছে, ঢাকার বাইরে চলে যাচ্ছে। তার ফলে পরিবহনের ক্ষেত্রটা বেড়েছে এখন অনেক। পরিবহনের সাথে সম্পর্কিত শ্রমিকদেরও সেরকম ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়মনীতি, কর্মঘন্টা কিংবা মজুরির কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। তার ফলে, আমরা দেখি তাদের লাইসেন্স ঠিক নাই, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই, প্রমোশনের জায়গা নাই। তাদের বিশ্বাসের ঠিক নাই, না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়। হেলপার, ড্রাইভার, পরিবহন শ্রমিক— এই পুরো খাতটাই একটা নৈরাজ্যের মধ্যে আছে। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো নিরাপত্তা কাঠামো নাই।

গ্রামাঞ্চলে কৃষক বা কৃষি শ্রমিকরা সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি। গ্রামে এখন যারা ছোট বা মাঝারি কৃষক যাদের জমি আছে— গুধুমাত্র কৃষি উৎপাদন করে তাদের জন্য টিকে থাকা খুব কঠিন। কৃষি ফসলের দামের কোনো স্থিতিশীলতা নাই। এই বিষয়ে সরকারি নীতি বা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনেরও সাংঘাতিক অভাব। তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামে যিনি ফসল উৎপাদন করছেন, তিনি সেই ফসলের দাম পাচ্ছেন না। শহরে যারা ওই ফসলটা কেনে, তাদের আবার অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। এই যে ভারসাম্যহীনতা, মানে গ্রামের কৃষকও ফসলের দাম পাচ্ছেন না, আবার

শহরের ভোক্তাকেও বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। ফলে শ্রমিক বা নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ সংগ্রহের কিংবা চাঁদাবাজীর অনেক স্তর তৈরি হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে অনেক স্তর থাকতো। এখন গ্রামের কৃষক আর শহরের ভোক্তার মধ্যে অনেকগুলো স্তর আছে। এখানে জনগণের নিরাপত্তায় নিয়োজিত যারা বা সরকারি দলের নেতাকর্মীদের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে চাঁদাবাজি। তার ফলে যারা ভোজ্য তারা টাকা দিচ্ছে, কিন্তু কৃষকরা টাকা পাচ্ছে না। এই চাপের মধ্যে থাকায় কৃষকরা অকৃষি খাতে তাদের আয় বাড়ানোর নানারকম চেষ্টা করছে। কৃষিকাজের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন অকৃষি কাজ যেমন দোকান দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিংবা কোনো ব্যবসার সাথে লগ্নি করছে, কিংবা বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ ও ফটকাবাজারে বিভিন্ন ব্যবসা করার চেষ্টা করছে। তারা এককালীন টাকা পেয়ে ইটের ভাটার কাছে জমিটা দিয়ে দিচ্ছে। এই ধরনের বিভিন্ন তৎপরতা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। যারা গরীব কৃষক তারা ভ্যান কিনছে, যারা একটু বড় কৃষক তারা ট্রাক কেনার চেষ্টা করছে। এই ধরনের অকৃষি তৎপরতার মাধ্যমে তারা টিকে থাকার চেষ্টা করছে। আর যারা ক্ষেতমজুর, সরাসরি যারা শ্রমিক, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কাজের নানা ক্ষেত্র সন্ধান করা। কৃষি কাজে কখনো কখনো কৃষি শ্রমিকের চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকে, বা ক্রাইসিস তৈরি হয়। এটা হচ্ছে তাদের আয় উপার্জনের একটা সময়। বছরের একটা বড় সময় তাদের এই সুযোগ থাকেনা। তখন তারা হয় পরিবহন শ্রমিকে পরিণত হয়, কিংবা শহরে এসে মুটে মজুরে বা নির্মাণ শ্রমিকে পরিণত হয়। ফলে একজনেরই বহুরূপ তৈরি হচ্ছে। ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, নির্মাণশ্রমিক, রিক্সাচালক, এরকম বিভিন্ন রূপ। ঢাকা শহরে অনেক রিক্সাচালক পাবেন যারা কয়েক মাস রিক্সা চালাচ্ছে, আবার গ্রামে চলে যাচ্ছে ও কাজ করছে। এরকম অনেক মানুষ আছে। একই মানুষের মধ্যে বহু চেষ্টা আছে।

এই যে শ্রমিকরা কাজ করে, এই শ্রমশক্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে নারীর একটা বড় ভূমিকা আছে। যেটা একটা অদৃশ্য শ্রম বলা যায়, যে শ্রম হিসাবের মধ্যে নাই, জিডিপির হিসাবের মধ্যে নাই, কিংবা সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যেও নাই। অস্বীকৃত এবং অদৃশ্য শ্রম। বাংলাদেশের কোনো নারী যদি উপার্জনের মধ্যে নাও থাকে, তাও বলতে হবে এই পুরো জিডিপি বা

শ্রমশক্তি বা উৎপাদন সমস্ত কিছুর পেছনে নারীর একটা বড় অবদান আছে। কারণ সে শ্রমশক্তি উৎপাদন করছে। একটা শ্রমিকের জন্ম, তার টিকে থাকা, মানুষ হিসেবে তার বেঁচে থাকা সবকিছুর পেছনে নারীর একটা বড় অবদান থাকে। এটা তো আছেই, এর বাইরে সরাসরি উপার্জনের জন্য নারীর ভূমিকা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। গার্মেন্টস-এও আমরা দেখতে পাচ্ছি, চা শ্রমিকদেরকে ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি। এর পাশাপাশি নির্মাণ কাজেও তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ঢাকা শহরের যেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ছোট ছোট দোকান দিয়ে বসা এবং অন্য নানা ধরনের কাজের মধ্যেও নারী শ্রমিক আছে। এছাড়া গৃহশ্রমিক হিসাবে তো আছেই।

নারী এবং পুরুষ শ্রমিকদের সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে আরেকটি দিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো ইনফর্মাল বা অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর। সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ শ্রমজীবীই অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করে। মানে তাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা নাই বা তাদের কোনো চাকরীর নিশ্চয়তা নাই, তাদের কোনো নিরাপত্তা নাই এবং তারা কাজ করছেন কেবল বেঁচে থাকার জন্য। অনেক সময় আমরা এটাকে বলি ‘টুকটাক অর্থনীতি’। অর্থাৎ যখন যেই কাজ পাওয়া যায়, সেই কাজ করছে। এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নারী-পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ থাকে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের নির্দিষ্ট কোনো কাজের ক্ষেত্র নাই। তারা এক এক সময় এক এক ধরনের কাজ করছে। তাদের প্রত্যক্ষ বস বা নিয়োগকর্তাও নাই। এরা হচ্ছে স্বনিয়োজীবী বা সেল্ফ এমপ্লয়ার এবং এরা বিরাট জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে আরেকটা জনগোষ্ঠীর বিরাট প্রভাব রয়েছে যারা বাংলাদেশে অনুপস্থিত। এরা হচ্ছে প্রবাসী শ্রমিক, যার সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। তার মানে বাংলাদেশে শিল্পকারখানা এবং তার সহযোগী যতগুলো তৎপরতা রয়েছে, তার চাইতে অধিক সংখ্যক শ্রমিক বাইরে কাজ করছে। এটা কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থারও একটা নতুন দিশা। প্রবাসী শ্রমিক বা মাইগ্রেন্ট লেবাররা একটা গ্লোবাল ক্লাস হিসেবে তৈরি হচ্ছে। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে। তারা যে ধরনের কাজগুলো করে সেখানেও নানা ধরনের চাপের মধ্যে তাদের থাকতে হয়। মজুরি নিয়ে সমস্যা থাকে, শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়, নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়। অনেকের আবার বৈধতার সমস্যা থাকে।

এরকম একটা অনিশ্চয়তা বাংলাদেশসহ বহুদেশের শ্রমিকদের থাকে। তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আয়টা করে। এদের মধ্যে অনেকে অকালে মারাও যাচ্ছে। প্রতিবছর প্রচুর লাশ আসে দেশে, কিন্তু তাদের পরিপূর্ণ হিসাব নাই যে কি কারণে এত কম বয়সে তারা মারা যাচ্ছে। স্ট্রেসের কারণে কিংবা চিকিৎসার অভাবে, কাজের চাপে, অনিশ্চিত যে জীবন তার কারণে, ঋণের যে বোঝা দেশে তৈরি হচ্ছে তার চাপের কারণে তারা মারা যাচ্ছে। তাদের অকালমৃত্যু ঘটছে। এরপরেও তারা যে টাকা পাঠাচ্ছে, এটা কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বড় অবলম্বন। বাংলাদেশে রিজার্ভ বেড়ে বেড়ে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার পার হয়েছিল, এটার সিংহভাগ অংশ এসেছিল গার্মেন্টস যারা বাংলাদেশে কাজ করছে এবং যারা প্রবাসী শ্রমিক বিদেশে কাজ করছে এই দুই জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে। প্রবাসী শ্রমিকরা প্রতি মাসে প্রায় দুই বিলিয়ন বা দুইশো কোটি ডলার দেশে পাঠাচ্ছে। আইএমএফ তিন বছরের জন্য যে ঋণ দিবে, যেটা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক হেঁচকি হচ্ছে, অথচ সেই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা প্রতি দুইমাসেই দেশে পাঠায়। কিন্তু তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোনো মনোযোগ নাই। সমাজের মধ্যে অবশ্য তার প্রভাব ব্যাপক। কারণ গ্রামাঞ্চলে ভোগের যে ধরন— যেমন মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, সিডি বা অডিও-ভিজুয়ালসহ বিভিন্ন তৎপরতা, এগুলোর সাথে নির্মাণ কাজ, ইটের বাড়ি হওয়া, ছেলেমেয়েদের জীবনযাপনের ধরন পাল্টে যাওয়া ইত্যাদির সাথে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো টাকা বা রেমিটেন্সের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু তারা এখানে বাস করে না। তাদের টাকার যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার ফলে যে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব দেখা যাচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে মূল্যস্ফীতি দেখা যাচ্ছে, জমির বা জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু তাদের টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না।

এছাড়া আরেকটা পরিবর্তন হচ্ছে সেটা হলো প্রযুক্তি। গত এক দশকে প্রযুক্তির পরিবর্তন বিশেষ করে ইন্টারনেটের উপর ভিত্তি করে নতুন নানা ধরনের কাজ তৈরি হচ্ছে। আবার ইন্টারনেট মোবাইল ফোন পর্যন্ত যাওয়ার ফলে গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত এখন অনলাইন একটিভিটি, অনলাইন কমিউনিকেশন, অনলাইন বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা তৈরি হয়েছে। এই ধরনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে আয়-উপার্জনের চেষ্টা এখন নতুন একটা উপাদান হিসেবে আসছে। ইদানীং ঢাকা শহরে আমরা দেখি এপভিত্তিক

বিভিন্ন কর্মসংস্থান যেমন উবার, পাঠাও, খাদ্য সরবরাহ করা- বেকার তরুণরা প্রাণপণে এসবের মধ্য কাজ করার চেষ্টা করছে। তবে সেই কাজেরও কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নাই। বলা হচ্ছে স্বাধীন কাজ, কিন্তু সেই কাজের যেই আয়, সেই আয়ের নিরাপত্তাহীনতা তাকে সবসময় তাড়া করতে থাকে। তার ফলে তরুণ যারাই এটার মধ্যে ঢুকছে, তাদের হয়তো সাইকেল বা মোটরসাইকেল বা গাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে। সবসময় কিন্তু তার দ্রুত কাজ শেষ করার তাড়া থাকছে। অর্থাৎ দ্রুত খাবারটা পৌঁছাতে হবে, দ্রুত জিনিসটা ডেলিভারি দিতে হবে। তাকে যারা এপের মাধ্যমে নিয়োগ করছে, নিয়োগকর্তা কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু নিয়োগকর্তাকে সে দেখতে পাচ্ছে না। তার ফলে তার দরকষাকষিরও কোনো সুযোগ নাই এবং সে কোনো সংগঠিত শক্তিও না। যেসব ড্রাইভার উবার চালাচ্ছে তারা বলছে যে, তারা যেই পরিমাণ আয় করছে, সেখান থেকে পঁচিশ-ত্রিশ ভাগ চলে যাচ্ছে। এখানে দেনদরবার করারও তার উপায় নাই এবং তার মধ্যে একটা অসহায় অবস্থা। এখানে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নাই যেই প্রক্রিয়া দ্বারা সে এটাকে ঠিক করবে। প্রিকারিয়েট বলে একটা শব্দ আছে। প্রলেটারিয়েট এবং প্রিকারিয়েট। প্রিকারিয়েট মানে এমন একটা জনগোষ্ঠী, এমন ধরনের শ্রমিক, যারা এরকম অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং মালিককে চিনে না, যার কোনো নিশ্চয়তা নাই, এরকম একটা অবস্থায় থাকে।

বাংলাদেশে এই যে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক, তাদের যে একটা নিরাপত্তাহীনতা, এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশে কোনো জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নাই। যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রমিকরা কিছুটা সংগঠিত, সেখানেও ট্রেড ইউনিয়নের পথে অযুত বাধা। যেমন গার্মেন্টস একটা প্রতিষ্ঠান, যেটার সাথে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র আছে। কিন্তু সেই গার্মেন্টসেও প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন দুর্লভ। পরিবহন শ্রমিকরা কাজ করে যে টার্মিনালগুলোতে সেখানেও ব্যাপক চাঁদাবাজি হয়। সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন সেভাবে তৈরি হয়নি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যারা আছে, তাদেরও কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নাই। কয়দিন পরপর শোনা যায় নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছে। তাদের কোনো নিরাপত্তা নাই বা ট্রেড ইউনিয়ন নাই ইত্যাদি। তার মানে একদিকে ন্যূনতম মজুরি নাই, আরেকদিকে তাদের সংগঠিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া, সংগঠিত হওয়ার যে সংগঠন, সেই সংগঠনও অনুপস্থিত। এটা হচ্ছে বাংলাদেশে খুবই কঠিন পরিস্থিতি।

বাংলাদেশে শুধু বাঙালিরাই থাকে না, আসলে আরো জনগোষ্ঠী আছে। কিন্তু সকল ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। বাংলাদেশ হলো মজুরের দেশ। এছাড়া যাকে মনে হচ্ছে যে শিক্ষিত, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, সে কারখানায় কায়িক শ্রম দেয় না, কিন্তু সেও আসলে এক ধরনের শ্রমিক। সে যে কম্পিউটারের মধ্যে দিয়ে কাজ করছে, বা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করে কাজ করছে, তার শ্রমশক্তিও কিন্তু মুনাফার জন্য আরেকজন ব্যবহার করছে। সুতরাং সেও কিন্তু এক ধরনের শ্রমিক। এইরকম মজুরের দেশে কিন্তু মজুরের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নাই, সংগঠনের অধিকার নাই এবং শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে তাদের শ্রম পরিদর্শনের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নাই। এছাড়া শিল্প পুলিশ বলে শিল্প কারখানায় যেই পুলিশ থাকে, তারা মূলত মালিকদের সন্ত্রাসী বাহিনী। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি। একটা দেশের ন্যূনতম মজুরি তো দারিদ্র্য সীমার নিচে হ'তে পারে না। গার্মেন্টসে যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনও কাজ করে, তাহলেও তাদের আয় জাতীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হবে। চা শ্রমিকরা এখন মজুরি পাচ্ছে দিনে ১৭০ টাকা। এটা কি করে একটা মজুরের মজুরি হতে পারে?

সরকারের উন্নয়ন প্রচারে দেখছি যে, জিডিপি বেড়ে যাচ্ছে, এর সাথে মাথাপিছু আয়ও বেড়ে যাচ্ছে। আমরা যদি মাথাপিছু আয়ের একটা হিসাব করি, তাতে নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-কর্মজীবী-বেকার প্রত্যেকের মাথাপিছু দৈনিক আয় হওয়ার কথা এক হাজার টাকা। তার মানে চারজন সদস্যের পরিবার হলে, সে চা শ্রমিক হোক, গার্মেন্টস শ্রমিক হোক, বা অপ্রাতিষ্ঠানিক হোক, হকার হোক, বা যা-ই হোক, যদি চারজনের পরিবার হয়, তাহলে দিনে চার হাজার টাকা আসার কথা। অর্থাৎ মাসে তার একলাখ টাকার বেশি আয় হবে। তার পরিবর্তে দুই-তিনজন কাজ করেও মাসিক আয় বিশ হাজারের কম হচ্ছে। কোনো কোনো পরিবারে এর চেয়েও কম হচ্ছে। চারজনে তার আয় হওয়ার কথা একলাখ টাকার বেশি, অথচ আয় হচ্ছে বিশ হাজার টাকা। আবার যদি চা শ্রমিকের কথা ধরেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেও যদি কাজ করে দৈনিক ৩৪০ টাকার মতো আয় হবে। তাহলে মাসে সে ১০ হাজার টাকার মতো পাচ্ছে। এটা তো কোনো আয় হলো না।

এই যে দেশজুড়ে ন্যূনতম মজুরির এইরকম একটা নিম্নমুখী চাপ, কিংবা এতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, তাদের কোনো সংগঠনের অধিকার নাই, এই

অবস্থার প্রধান কারণ হলো শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা। শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিশালী ভিত্তি ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তখন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের শক্তিশালী ভিত্তি ছিল। তাদের রাজনৈতিক অবস্থান স্বাধীনতার পর ক্রমে দুর্বল হতে হতে আশির দশকে একদমই ধ্বংসে পড়ে। এই ধারায় ২০০২ সালে আদমজি পাটকল ভেঙে দেওয়া হলো।

পুঁজি ও শ্রমের যে লড়াই সেখানে পুঁজি বাংলাদেশে অনেক শক্তিশালী আর বিজয়ী অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে সামরিক শাসনের মধ্যে দিয়ে, নব্বই দশক থেকে যে তথাকথিত নির্বাচিত সামরিক সরকারগুলো এসেছিল, তাদের কেউই এই ধারাবাহিকতায় কোনো পরিবর্তন আনেনি। শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার কারণেই তাদের মজুরি এবং সংগঠন, সবগুলোই একটা দুর্বল অবস্থার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু নিপীড়ন, শোষণ, আধিপত্য, নির্যাতন এগুলো যদি বাড়তে থাকে, মানুষ তার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করবে। সেটারই আমরা প্রকাশ নানাভাবে দেখি, যেমন ২০০৬ সালে একটা গণঅভ্যুত্থানের মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনে— পুরো ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জে।

এছাড়া প্রায়ই আমরা দেখি গার্মেন্টস শ্রমিকরা রাস্তায় এসে প্রতিবাদ করছে। চা শ্রমিকরা সবচাইতে বেশি নিপীড়িত অবস্থায় আছে। তারাও গত বছরে বেশ কিছুদিন একটানা লড়াই করেছিল। সেটা আর অগ্রসর হতে পারেনি কারণ পুরো দেশেই এমন একটা অগণতান্ত্রিক পরিবেশ যে গোয়েন্দা সংস্থা, সরকারি ছাত্র সংগঠন, সন্ত্রাসী, বিভিন্ন ধরনের চাপ রয়েছে। এর ফলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের শ্রমিকরা। একটা দেশে যখন শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার কম থাকে, যখন তাদের সংগঠনের অধিকার কম থাকে, সবচাইতে নিরাপত্তাহীন এবং নির্যাতিত অবস্থার মধ্যে তারা পড়ে। আর তাদের মধ্যে বেশি নিরাপত্তাহীন আবার নারীরা। কারণ তাদের অভিযোগ জানানোর তখন উপায় থাকে না। তাদের আন্দোলন করার, সংগঠন করার, দাবি জানানোর, লড়াই করার যত মাধ্যম আছে, সবগুলোই বাধাগ্রস্ত। সেই কারণেই এই ধরনের সৈরিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সবসময়ই ধনীক শ্রেণির কাছে খুবই কাঙ্ক্ষিত একটা ব্যবস্থা। কারণ এই ব্যবস্থায় কোনো জবাবদিহি থাকে না, কোনো স্বচ্ছতা থাকে না। সেটাই তারা চায়।

ধনীক শ্রেণি যত সংগঠিত তত ব্যাংক লুটপাট, দেশের জন্য সর্বনাশা সব প্রকল্প। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর খরচ অনেক বেশি। সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল সড়ক হচ্ছে বাংলাদেশে। ঢাকা-মাওয়া সড়ক হচ্ছে সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল সড়ক। সবচেয়ে ব্যয়বহুল সড়ক ভেবে আমরা হয়তো আনন্দ পেতে পারি, কিন্তু এটার ব্যয়ের বোঝাটা তো আমাদের বাংলাদেশের মানুষকেই বহন করতে হবে। এছাড়া সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্রও হচ্ছে বাংলাদেশে। এসব উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ঋণ নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে। আর সেই ঋণের বোঝা বাংলাদেশের মানুষকেই বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু এই যে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে, এর সুবিধাভোগী হচ্ছে ধনীক শ্রেণি। এটার কমিশন যারা পাচ্ছে, কন্সট্রাকশনের সাথে যারা আছে, যারা মালামাল সাপ্লাই দিচ্ছে তারাই সুবিধাভোগী এবং তাদের সম্পদটা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। দেশে যদি একটা জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু তারা ইচ্ছামত ব্যাংক লুটেছে, উন্নয়ন প্রকল্প বাড়াচ্ছে এবং নদীনালা-বন-জঙ্গল পর্যন্ত দখল করেছে। গাছপালা কেটে বিরাণ করছে। সরকারি ডকুমেন্টের মধ্যেই আছে যে গত ১০ বছরে যেসময় জিডিপির বৃদ্ধির হার সবচাইতে বেশি, সেই সময় বন উজাড়ও সবচেয়ে বেশি। এর পাশাপাশি বায়ু দূষণের হারও গত ১০ বছরে সবচেয়ে বেশি। নদী দখল, জলাভূমি দখল করে তারা বিরাট বিরাট আবাসন প্রকল্প করছে। এর মধ্যে দিয়ে জিডিপি বাড়ছে। কিন্তু পরিবেশগত যে বড় দুর্যোগের মধ্যে আমরা পড়ছি সেটার শিকার হচ্ছে কিন্তু আবার শ্রমজীবী মানুষ। তার ফলে বাংলাদেশে আরেকটা আন্দোলন তৈরি হচ্ছে, যেটার মধ্যে ঠিক শ্রেণি আন্দোলন না, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ কিংবা স্বার্থই সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে বৈষম্য, নিপীড়ন আর সর্বজনের সম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে লড়াই ঠিকই তৈরি হয়েছে। লড়াইয়ের বিভিন্ন ধরন দেখি আমরা, যেমন আমরা ফুলবাড়িতে লড়াই দেখেছি কিংবা সুন্দরবন নিয়ে লড়াই দেখেছি। এটা বাংলাদেশের সমাজে শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের পাশাপাশি আরেক ধরনের লড়াই যেখানে অংশগ্রহণ করে বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষ আর তার সাথে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ।

মধ্যবিত্তের স্বার্থ যেখানে আছে, সেটা হলো পরিবেশ আন্দোলন। নদী রক্ষা বা বন রক্ষা বা গাছ রক্ষার আন্দোলন কিংবা যেসব উন্নয়ন প্রকল্প

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, সেসব উন্নয়ন প্রকল্পবিরোধী আন্দোলন হচ্ছে সেগুলোতে কতিপয় গোষ্ঠী ছাড়া সকলেরই স্বার্থ আছে। ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত কয়লাখনি বিরোধী একটা আন্দোলন হয়েছিল। সেখানে কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ বেশি ছিল। বাঙালি, সাঁওতাল বিভিন্ন জাতি সেখানে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। নারী-পুরুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলোও বার্তা দিচ্ছে যে বাংলাদেশে কোন ধরনের আন্দোলনগুলো মানুষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এসব আন্দোলনে শুধুমাত্র এক শ্রেণির মানুষ আছে এরকম নয়। বিভিন্ন শ্রেণি, জাতি, ধর্মের মানুষ সেখানে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সুন্দরবন আন্দোলনও এইভাবে হয়েছে। সুন্দরবন মানুষকে রক্ষা করে। এছাড়া যারা সেখানে বাস করে, সেটা না থাকলে তার ফলে ক্ষতি তাদেরই বেশি হবে। যারা ধনীক শ্রেণি, তারা তো ওই জায়গায় থাকবে না। তারা বাংলাদেশেও থাকে না, তারা থাকে বিদেশে। বাংলাদেশ হচ্ছে তাদের টাকা বানানোর জায়গা। বাংলাদেশে যারা থাকে, তাদের জন্য সুন্দরবন খুব দরকার। সেখানে আমরা সুন্দরবন আন্দোলনও দেখেছি একটা বিপুল সংখ্যক মানুষের সম্পৃক্ততা তৈরি করেছে।

অন্যদিকে অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে যারা আছে, একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে, সে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো মালিক পাচ্ছে না। কিন্তু তার লড়াই করতে হবে, কারণ তার সন্তানের শিক্ষা দরকার, তার চিকিৎসার অধিকার দরকার, তার নিরাপত্তা দরকার, তার আয় দরকার, তার বাসস্থান দরকার। এগুলো সবই তার দরকার। তাহলে লড়াই কিভাবে হবে? কিংবা যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে বাংলাদেশে বা অন্য দেশে, পুঁজির কেন্দ্রীভবন যেভাবে হচ্ছে, পুঁজির আত্মসন যেভাবে হচ্ছে, যেখানে বাংলাদেশের ধনীক শ্রেণিও আছে, আন্তর্জাতিক ধনিক প্রতিষ্ঠান ও দেশও আছে। যেমন বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ভারত ও চীন আছে। রাশিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আছে। বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানির দখলে। তার মানে বিভিন্ন দেশ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, তার সাথে বাংলাদেশ সরকার, তার সাথে সবাই আছে। একটা আন্তর্জাতিক জোট তৈরি হয়েছে, বিশ্বজোট তৈরি হয়েছে। আর এর শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ। তাহলে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শ্রেণিগতভাবে তার টিকে থাকার লড়াই, আরেকটা হচ্ছে যারা

ধনীক শ্রেণি না, তাদের বাইরে, সবারই একটা অভিন্ন স্বার্থের জায়গা। তাকে নদী রক্ষা করতে হবে, বন রক্ষা করতে হবে, জীবন-জীবিকা রক্ষা করতে হবে, সন্তানের চিকিৎসা লাগবে, শিক্ষা লাগবে।

তাহলে লড়াই এখানে রাষ্ট্র বনাম জনগণের। এখানে রাষ্ট্র ধনীক শ্রেণিকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে, মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে আন্তর্জাতিক পুঁজির মধ্যস্থতা করছে। কিন্তু সর্বজনের চিকিৎসার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বন রক্ষার অধিকার, নদী রক্ষার অধিকার— এগুলো রক্ষা করতে হলে রাষ্ট্রকে এই ভূমিকা থেকে সরাতে হবে। সুতরাং একটা বড় লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে রাষ্ট্রের সাথে। একদিকে মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের লড়াই, আরেকদিকে যারা প্রবাসী শ্রমিক, দেশের শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষ, বেকার জনগোষ্ঠী এবং সাধারণভাবে সর্বজনের স্বার্থ এবং অধিকার। সেখানে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রকেই তারা মুখোমুখি পাচ্ছে। এটা হচ্ছে নতুন পর্ব, যেখানে রাষ্ট্রকে মোকাবেলা করে তার ভবিষ্যৎ যে স্বার্থ সেটাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ওই জায়গাটায় আমি মনে করি নতুনভাবে এখন লড়াই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনো সেগুলো খুবই সাধারণ অবস্থায়, মানে খুবই প্রাথমিক অবস্থায় আছে। এই পরিবর্তনগুলো উপলব্ধি করে রাজনৈতিকভাবে নতুন কোনো চিন্তা আসা, বুদ্ধিবৃত্তিক যে তাত্ত্বিক চিন্তা সেটাকে ধারণ করা এবং সংগঠনের মধ্যে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা দরকার। এগুলো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে বা চিন্তার পর্যায়ে আছে। এই পরিবর্তন অনুযায়ী লক্ষ্য নির্ধারণ করা, সংগঠন তৈরি করা, জনমত তৈরি করা দরকার। এই ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের একটা বড় ভূমিকা আছে, মধ্যবিত্তের মধ্যে যারা চিন্তা করতে সক্ষম, যারা লেখাপড়া করতে সক্ষম, বা যারা লেখালেখি করে, যারা সাংস্কৃতিক তৎপরতার মধ্যে আছে এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী নিজেরাও কিন্তু দুর্ভোগের শিকার। তাদের চিন্তা করতে হয় যে সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয়, সকলের চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে তিনটা রোগ খুব বেড়ে যাচ্ছে: একটা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট, দ্বিতীয় হচ্ছে হৃদরোগ, মানে হার্ট এটাক, স্ট্রোক এই ধরনের অসুখ বাড়ছে, আরেকটা বাড়ছে ক্যান্সার। এসব রোগ বাড়ার সাথে বর্তমান উন্নয়নধারার একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। এখানে নিরাপদ খাদ্য নাই, বায়ুদূষণ, পানি ঠিকমতো পাচ্ছেন না। সারাক্ষণ একটা স্ট্রেসের মধ্যে থাকতে হচ্ছে, রাস্তায় বের হলে নিরাপত্তা নাই, গণপরিবহনের কোনো ঠিক নাই। এই যে

সারাক্ষণ একটা স্ট্রেসের মধ্যে নিম্নবিভ, মধ্যবিভ, নিম্নমধ্যবিভদেরকে থাকতে হয়, এটা থেকে তো মুক্তি দরকার। ঢাকার আশেপাশে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু নদী আছে। এই নদীগুলোর পানি যদি স্বচ্ছ থাকতো, নদীগুলো যদি দখল না হতো, নদীগুলো দিয়ে যদি পানি যেতে পারতো তাহলে ঢাকা শহরের পানি নিষ্কাশনটা ঠিকমতো হতো। আরেকটা হচ্ছে, এই নদীগুলো যদি স্বচ্ছ থাকতো, ঢাকা শহরের ভেতরে যদি গাছপালাগুলো ঠিকমতো থাকতো, তাহলে ঢাকা শহরের মানুষের রোগ অর্ধেক কমে যেতো। অনেক রকম রোগ থাকতো না। কিন্তু এখন শ্বাসকষ্ট, ক্যান্সার বেড়ে যাচ্ছে, হার্ট এটাক বেড়ে যাচ্ছে। এসব রোগ যদি কোনো পরিবারে হয়, কয়টা মধ্যবিভ বা পেশাজীবী পরিবার আছে বাংলাদেশে যারা এর চিকিৎসা ব্যয় নিজেরা নিজেদের আয় থেকে বহন করতে পারে? ধনীক শ্রেণি যারা, তাদের পক্ষেই কেবল সম্ভব।

কিন্তু চিকিৎসা ব্যয় বাড়ছে কেন? চিকিৎসা তো মানুষের অধিকার। পাবলিক হেলথকেয়ার সিস্টেম বা সর্বজনচিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে পুরোপুরি বিপর্যস্ত। তার ফলে ডেপুট চিকিৎসা করতেই লাখ টাকা লেগে যাচ্ছে। আর যদি ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়, ২০-৩০-৪০ লাখ, কোনো ঠিক নাই। সুতরাং এটা কোনো পেশাজীবীর পক্ষে সম্ভব না। শিক্ষাকে একটা অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সেটা ঠিকঠাক করা, নদীগুলোকে রক্ষা করা, বনকে রক্ষা করা, এগুলো নির্দিষ্ট কোনো মালিকের কাজ না। এগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র এমন শ্রেণিকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে, যারা চিকিৎসাকে ব্যয়বহুল করছে, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করছে, নদী শেষ করে দিচ্ছে, বন শেষ করে দিচ্ছে। এর শিকার কিন্তু এই মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে। বাকি সকলের এই অভিন্ন স্বার্থটা, এই অভিন্ন লক্ষ্যটা এবং লড়াইয়ের জায়গাটা শনাক্ত করা দরকার এবং সেই অনুযায়ী সক্রিয়তা তৈরি করা, জনমত তৈরি করা, সংগঠন তৈরি করা প্রয়োজন।

এই কাজগুলো তো মধ্যবিভের মধ্য থেকে আসার কথা কিন্তু মধ্যবিভের এই ভূমিকা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট রূপ নেয়নি। এই স্পষ্ট রূপ নেওয়ার উপরে নির্ভর করে মধ্যবিভের নিজের সারাক্ষণ একটা বিপদের মধ্যে, দুর্যোগের মধ্যে, স্ট্রেসের মধ্যে, বিপর্যয়ের মধ্যে থাকা থেকে মুক্তি, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুক্তি। এর পাশাপাশি যে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ, তাদের ন্যূনতম মানুষের জীবন পাওয়ার জন্য যে লড়াই, সেটাও এর ওপরে

অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং এই জায়গাটা স্পষ্ট রূপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে মধ্যবিভ যারা চিন্তাশীল অংশ, শিক্ষিত অংশ, তাদের দায়িত্বটাই প্রধান। এই দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হবে।

মুক্ত আলোচনা

সুরাইয়া বেগম: রাষ্ট্রের প্রকৃতির কথা আপনি বলেছেন। শ্রমিকের প্রেক্ষাপট থেকে যদি রাষ্ট্রকে দেখি, তার কাছে রাষ্ট্রকে নিজের প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করাটা কী সহজ? সরকারকে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু বিমূর্ত, তাহলে শ্রেণি সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমিকের লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ এখানে কে হবে? এছাড়া আমাদের রাষ্ট্র চরিত্র বিষয়ে যদি বলেন যে, এটা কী গণতান্ত্রিক নাকি কল্যাণমূলক নাকি সমাজতান্ত্রিক নাকি ধনতান্ত্রিক? কারণ কিছু কিছু কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা দেখি রাষ্ট্রের ভূমিকা কখনও জনকল্যাণমূলক, আবার কখনও বিপরীতধর্মী। ফলে এটা এক ধরনের কনফিউশন তৈরি করে কিনা? মধ্যবিভ শিক্ষিত শ্রেণিকে আপনি দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু সাধারণত মধ্যবিভ শ্রেণিকে বলা হয় সুবিধাভোগী শ্রেণি। তাহলে মার্শের তত্ত্ব অনুযায়ী, শ্রমিক শ্রেণির মাধ্যমে শ্রেণিহীন সমাজ হবে, এই প্রত্যয় আদৌ সম্ভব কিনা? সেক্ষেত্রে মধ্যবিভ শিক্ষিত, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সমন্বয় কিভাবে হবে? এখানে একটা নেতৃত্বের ব্যাপার চলে আসে। তাহলে মধ্যবিভের ভূমিকা কী হবে? এছাড়া শ্রমিকের সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিভাবে তা হতে পারে? বাংলাদেশে দেখা যায় মধ্যবিভ শ্রেণি রাষ্ট্রীয় সহায়তায় পরিপুষ্ট হয়ে ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। তাহলে এই মধ্যবিভ শ্রেণির প্রতি শ্রমিক শ্রেণি আস্থা রাখতে পারবে? যদি ধরে নিই যে সেটাও হতে পারে, তাহলে রিইব যে পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে, যেখানে মানুষের সাথে সম্পর্কটা সাবজেক্ট-অবজেক্ট না হয়ে সাবজেক্ট-সাবজেক্ট হয়। সেক্ষেত্রে মধ্যবিভ শ্রেণি, কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৃষক-শ্রমিকের চেতনার জায়গাটা যদি একটা লেভেল-এ না পৌঁছতে পারে তাহলে মধ্যবিভ শ্রেণির সাথে এসব শ্রেণির সম্পর্কটা সাবজেক্ট-অবজেক্ট হতে পারে। আপনার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মনে প্রশ্ন জাগে যে, মধ্যবিভ শ্রেণিকে যদি এই দায়িত্ব নিতে হয়, তাহলে কখনও কি এরকম পর্যায় আসবে কিনা যেখানে শ্রমিক শ্রেণি মধ্যবিভ শ্রেণিকেই আবার শ্রেণি শত্রু

হিসাবে বিবেচনা করবে কিনা এবং লড়াইটা এইখানেই করবে কিনা? এ বিষয়টা আর একটু স্পষ্ট করার দাবী রাখে।

আনু মুহাম্মদঃ ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র খুব বিমূর্ত প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। শ্রমিকরা প্রথমেই মালিকের সম্মুখীন হয়। গার্মেন্টস, শিল্প কারখানা, নির্মাণ কাজে নিয়োজিত হলে শ্রমিকরা মালিক বা নিয়োগকর্তাকে দেখতে পায়। তার দাবী-দাওয়া বা অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা সেটা মালিকের সামনেই হয়। সেটা করতে গিয়ে বা সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা রাষ্ট্রকে চিনতে পারে। গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে যখন শ্রমিকের এই প্রচেষ্টা চলে, অর্থাৎ শ্রমিকরা যখন ন্যূনতম মজুরির দাবী তুলছে বা তাদের বকেয়া পাওনা বা তাদের উপর অত্যাচার হলে সেটার সমাধান বা কাজের নিরাপত্তা নিয়ে দাবী তুলছে, তখন তারা রাষ্ট্রকে দেখতে পায়। তারা যখন নির্যাতিত হচ্ছে তখন শিল্প পুলিশের কোন খবর নাই, কিন্তু তারা যখন ভুগতে ভুগতে কোন দাবী জানাচ্ছে তখন শিল্প পুলিশ আক্রমণ করতে চলে আসে। এই শিল্প পুলিশ কে? শিল্প পুলিশই হচ্ছে রাষ্ট্র। শুধু শিল্প পুলিশই নয়, এরপর থানার পুলিশ আসবে, তারপর মামলা— এই সমস্ত কিছুর মধ্যে রাষ্ট্র আছে। এই যে গ্রন্থিগুলো মিলে একটা জালের মত ছড়ানো, যেখানে মালিকানা ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো একটার সাথে একটা সম্পর্কযুক্ত, এই জালটাকে সনাক্ত করা বা যে কারও পক্ষে চট করে বোঝা সম্ভব হয় না। মধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবী— কারও পক্ষেই সহজ না। এগুলো কাজ বা লড়াই বা তাত্ত্বিক লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়। এটা হঠাৎ করে পরিষ্কার বোঝা যায় না। এটার সাথে আন্দোলন-লড়াই এর একটা সম্পর্ক আছে।

একজন রিক্সাচালক কার সাথে মোকাবেলা করবে? কিছুদিন আগে ফেসবুকে একজন দেখাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকের চেয়ে রিক্সাচালকের দৈনিক মজুরি বেশী। কিন্তু একজন প্রভাষক কী রিক্সা চালাতে রাজি হবেন? সেটা তো হবেন না। তাহলে কম মজুরী হলেও প্রভাষক এই চাকরী করছেন কেন? এখানে যে রিক্সাচালকের হিসাব দেওয়া হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন একজন চাক্ষু ও শক্তিশালী যুবক। এছাড়া তার পিক আওয়ারের বা মাসের যে কয়দিন রিক্সা চালাচ্ছেন, সেসময়ের আয়ের হিসাবটা নেওয়া হচ্ছে। আসলে কয়েক বছর পরই এই আয়টা আর থাকবে না। এছাড়া মাসের প্রতিদিন তিনি রিক্সা চালাতে পারবেন না। মধ্যবিত্তরা এই ধরনের হিসাব দেখায় যে

রিক্সাচালকরা তার থেকে ভাল আছে, মজুররা তার চেয়ে ভাল আছে, গার্মেন্টস শ্রমিকরা হচ্ছে দেশের শত্রু— এগুলো কিন্তু মধ্যবিত্তের মধ্যেই দেখা যায়। পত্রপত্রিকায় এ ধরনের লেখা ছাপা হয়। অথচ মধ্যবিত্ত নিজেও কিন্তু নানা রকম বিপদের মধ্যে আছে। অথচ মধ্যবিত্ত প্রধান শত্রু হিসাবে বিবেচনা করছে শ্রমজীবী মানুষকে। কারণ সেও শ্রমজীবী মানুষের সেবা নেয়। তার কাছে মনে হয় শ্রমজীবী মানুষই ভাল আছে তার চেয়ে। একজন রিক্সাচালক যখন রাস্তায় বের হয়, তখন তাকে রাষ্ট্রকেই মোকাবেলা করতে হয়। সে হয়তো প্রথমেই রাষ্ট্রকে চিনতে পারে না। কিন্তু যে তাকে লাঠিপেটা করে বা যে তার টায়ার পাংচার করে দেয়, সেটা কিন্তু রাষ্ট্র বা পুলিশ। তাকে প্রতিদিনই রাষ্ট্রকে মোকাবেলা করতে হয়। এছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যারা আছে, যেমন ফুটপাথের দোকানদার যখন বাঁকা নিয়ে বসে, প্রতিদিন তাকে চাঁদা দিতে হয়। বর্গফিট অনুযায়ী বসুন্ধরা শপিং মলের দোকান ভাড়ার সাথে যদি ফুটপাথের দোকানের ভাড়া বা পুলিশ বা সরকারি দলের মাস্তানের চাঁদা হিসাব করেন, তাহলে দেখা যাবে ফুটপাথের ভাড়া বেশী পড়ছে। চাঁদা দেওয়ার পরও তার নিরাপত্তা নাই। যে কোন সময় তার উপর হামলা হতে পারে, ফলে তাকে সবসময় তটস্থ থাকতে হয়। যাদের দ্বারা তিনি আক্রান্ত, সেটাই হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র এমনিতে বিমূর্ত, কিন্তু মূর্ত ভাবেই তো আমাদের সবার সামনে হাজির হচ্ছে। রাষ্ট্র যখন উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচ্ছে, আমার এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি করছে, বা আমাকে অসুস্থ করে দিচ্ছে, বা আমার শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যয় বহন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব— এই যে রাষ্ট্রের ভূমিকা সেটা মানুষের সামনে অনেক সময় স্পষ্ট হয় না।

হ্যাঁ এটা ঠিক যে, রাষ্ট্র মাঝে মাঝে তো জনকল্যাণমূলক ভূমিকাও পালন করে। আসলে জনকল্যাণমূলক ভূমিকা পালন করে না এরকম কেউ নাই। আগেকার দিনে যারা রাজা-বাদশা ছিল, বা যারা জমিদার ছিল, বা ধরেন একটা মানুষ যার নামে দশটা খুনের অভিযোগ আছে, কিংবা একজন নদী দখলকারী— এরা কী জনকল্যাণমূলক কোন কাজ করে না? করে, সে মুসলমান হলে যাকাত দেয়, মসজিদে চাঁদা দেয়, হিন্দু হলে মন্দিরে চাঁদা দেয়, কিংবা এতিমদের খাওয়ায়। এই ধরনের কর্মসূচি দিয়ে তো আসলে বোঝা যাবে না কার ভূমিকাটা কী। বাংলাদেশ একটা প্রান্তিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তার মধ্যে একটা প্রান্তিক রাষ্ট্র। এর মধ্যে অনেক ধরনের সামন্ত সংস্কৃতি আছে, কিন্তু প্রধান ভূমিকা পুঁজিবাদী।

তাহলে নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে? সম্পত্তি মালিকানা শ্রেণি স্বার্থ তৈরি করার একটা প্রক্রিয়া। সম্পত্তি নিজেই শ্রেণি স্বার্থ তৈরি করে। সম্পত্তির মালিকের যদি আরও সম্পত্তি বানাতে ইচ্ছা করে, এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে স্পষ্ট করে। যদিও এটা প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও ছিল। এখানে সম্পত্তির মালিকানায় মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। যার সম্পত্তি সবচাইতে কম তার মধ্যেও সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা হতে পারে। এটা শ্রমিকের মধ্যেও হতে পারে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাদের এরকম আকাঙ্ক্ষা আছে, তার তো অবশ্যই দেশের ধনিক শ্রেণি বা নীতিনির্ধারকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশে একজন সর্বোচ্চ সরকারি কর্মকর্তা, ধরা যাক একজন সচিব, একজন শিক্ষকের উপরেও যার স্থান দেওয়া হয়েছে, তার যে বেতন সেটা দিয়ে তার সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, পরিবারের চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি হয় না। আয় করার নানারকম কায়দা কানুন তাদের আছে। দেখা যায় একজন আমাদের প্রধান আয় হচ্ছে কোন চুক্তি বা কোন কোম্পানির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা অবসর গ্রহণের পর একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ঢুকে যায়। উনি যে মন্ত্রণালয়ে ছিলেন, সেই মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রাইভেট কোম্পানিতে যদি যোগদান করেন, তাহলে বুঝতে বাকি থাকার কথা না যে, তিনি দায়িত্বে থাকার সময় ঐ প্রাইভেট কোম্পানিকে সার্ভিস দিয়েছেন। এই সার্ভিস দেওয়ার প্রক্রিয়ায় দেশের জনগণের জন্য অনেক বিপজ্জনক ব্যাপার ঘটে; এরকম অনেক ধরনের চুক্তি হয়। অর্থাৎ ধনী হওয়ার প্রক্রিয়া যেটা তাতে পেশাজীবী বা মধ্যবিত্ত হিসাবে যে স্বাভাবিক জীবন যাপন তাতে হয় না। তাকে সেই পথে যেতে হয়, যে পথে বন শেষ হবে, নদী শেষ হবে, কিংবা দেশের জন্য বিপজ্জনক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন। তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, একজন বিজ্ঞানী— কিন্তু তিনি এমন সব প্রকল্পকে বৈধতা দিচ্ছেন, যেমন ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্পের কথা আমরা বলতে পারি। এটি একটি ভয়ঙ্কর প্রকল্প, যাতে উত্তরবঙ্গ ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হতে পারতো। এই প্রকল্পকে উন্নয়ন প্রকল্প বলেছে এরকম তো অনেক কনসালটেন্ট আছে, যারা বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ইত্যাদি। অর্থাৎ সে এমন ধরনের কাজের মাধ্যমে বাড়তি উপার্জন করছে, যার মধ্যে দিয়ে পুরো দেশের একটা সর্বনাশ হচ্ছে।

এই ধরনের লোক তো এই বৃহৎ স্বার্থের আন্দোলনে আসবে না। আমি বলছি, মধ্যবিত্তের মধ্যে যারা শ্রেণিগতভাবে উপরে উঠার জন্য লালায়িত নয়, যে নিজেকে অন্য সমষ্টির সাথে সম্পর্কিত করতে পারবে, তাদের কথা বলছি। ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে এক ধরনের স্বার্থ আছে, সন্তানের শিক্ষা বা চিকিৎসার জন্য এমন টাকা আয় করা, যাতে সবচেয়ে ভাল স্কুলে পড়তে পারে বা দামী হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে পারে; এটা এক ধরনের স্বার্থবোধ। আরেক ধরনের স্বার্থবোধ হচ্ছে যে, সারা দেশের পাবলিক শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে এমন হয় যেন উন্নত মানের শিক্ষা আমার সন্তান খুব সহজেই পায়। এর সাথে টাকা পয়সার সম্পর্ক নাই। আমার অসুস্থতা হলে আমি যেন খুব ভাল চিকিৎসা পাই সেরকম একটা পাবলিক হেলথ কেয়ার সিস্টেম যেন দেশের মধ্যে গড়ে উঠে। এরকম গড়ে উঠলে আমার টাকা দরকার নাই। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নীতিটা পরিবর্তন হলে, আমার মত আরও অসংখ্য মানুষের স্বার্থটা পূরণ হয়। মানে ব্যক্তির স্বার্থ আর সমষ্টির স্বার্থ তখন একাকার হয়ে যায়। মধ্যবিত্তের মধ্যে থেকেই কিন্তু এ ধরনের মানুষ আসে, যারা চিন্তা, লেখালেখি, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে, সৃজনশীলতা থাকে। এ ধরনের মানুষের কিছু দায়িত্ব আছে। যেটা বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের দায়িত্ব থাকে যে, ভবিষ্যতকে দেখতে পারা বা ভবিষ্যতকে দেখানোর জন্য কাজ করা, বা মানুষের মধ্যে এই যে রাষ্ট্রের জটিলতা বা আন্তর্জাতিক বাগাড়ম্বর করে নানা কিছু ঢেকে রাখা হয়, সেগুলোকে উন্মোচন করা, এগুলো এই ধরনের মধ্যবিত্তের কাজের মধ্যে পড়ে। তারা এই কাজগুলো করলে সেটা তার নিজের জন্যও ভাল এবং সকল মানুষের জন্যও ভাল। এটা ঠিক শ্রেণি হিসাবে না, বরং শ্রেণি থেকে সরে এসেই তাকে এই কাজটা করতে হয়। এর মাধ্যমে সে ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে এক ধরনের মুক্তিও পাচ্ছে।

বাংলাদেশে বাম আন্দোলনের বিরাট ইতিহাস আছে। কিন্তু এর একটা বড় দিক হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা। ক্ষমতার প্রত্যেকটা পর্বে দেখবেন বাম আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসঘাতকতা করে ডানপন্থী বা বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের সাথে যোগ দিয়েছে। এগুলো সত্তর দশক থেকে শুরু হয়েছে, এরপর বিভিন্ন সময় এগুলো দেখা যায়। এরকম যারা করবে, তাদের প্রতি তো মানুষের আস্থা থাকবে না। এই ধরনের মানুষের কারণে সাধারণভাবে মানুষের আশা, ভরসা, আস্থা কিংবা সাহস অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মতিউর রহমান (সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব, নীলফামারী): কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও পুঁজিবাদের প্রভাবে হাজার হাজার কৃষি শ্রমিক ও ক্ষুদ্র বর্গাচারী কৃষি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। যেমন বরেন্দ্র অঞ্চলে হাজার হাজার হেক্টর জমি বাণিজ্যিক আম চাষের আওতায় চলে যাচ্ছে। এখানে বাইরে থেকে ধনিক শ্রেণি কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে জমি লিজ নিয়ে আম, কমলা, মাল্টা, ড্রাগন ফল বাগান করছেন। ফলে নারী ও পুরুষ কৃষি শ্রমিক, বিশেষ করে আদিবাসী শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছে। কারণ ফল বাগানে তেমন কাজ থাকে না। আগে আদিবাসী ও বাঙালী কৃষি শ্রমিক পারিবারিক শ্রম দিয়ে বর্গা চাষ করতো। এখন তাদের সেই সুযোগ নেই। বলা যায় কৃষি থেকে তারা উচ্ছেদ হচ্ছে। অন্যদিকে ধান চাষ না হওয়ায় তাদের খোরাক কিনতে হচ্ছে। এজন্য তারা কঠিন সময় পার করছে। এর পাশাপাশি বলা যায়, ব্যাংক হচ্ছে নতুন ধনিক শ্রেণি এবং এরা জনগণের শোষক। ব্যাংকে যারা চাকুরি করে তারাই হাউজ লোনের নামে কোটি কোটি টাকা লোন নিচ্ছে, সাধারণ জনগণ পাচ্ছে না। বেসরকারি ব্যাংকে পনেরো লক্ষ টাকা দিয়ে চাকুরী নিয়ে তারাই এই ধরনের কাজ করছেন।

আনু মুহাম্মদ: এসব প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে। আমি মনে করি, এগুলো সঠিক পর্যবেক্ষণ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পুঁজির আগ্রাসন হচ্ছে এখনকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইটের ভাটা, অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের নানা ধরনের পরিকল্পনা, আবাসন, লাভজনক চাষ, ফসল আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবহৃত নানা ধরনের রাসায়নিকের কারখানা- এগুলো সবই জিডিপি বাড়ায়। রাসায়নিক দিয়ে ফল পাকালে মানুষের অসুখ হয়, কিন্তু এসব কেমিক্যালের উৎপাদন-বিতরণ-কর্মসংস্থান জিডিপি বাড়ায়। এতে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় জমি চলে যায় এবং এই প্রক্রিয়ায় নানা বিষাক্ত কাজও করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পুঁজির পুঞ্জিভবন ঘটছে। কিছু মানুষের হাতে প্রচুর টাকা চলে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের অনেক উন্নয়ন হচ্ছে এবং জিডিপি অনেক বাড়ছে। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক মানুষ ও উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা আক্রান্ত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে টুরিজমের আগ্রাসনের ফলেও মানুষ উচ্ছেদ হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বান্দরবানে পাঁচ তারকা হোটেল করা হবে। পাহাড়ে এগুলো করার ফলে পুরো অঞ্চলে একটা মহাবিপর্ষয় হওয়ার মত অবস্থা। এগুলো হচ্ছে পুঁজির আগ্রাসনের এক একটা চেহারা। এগুলো সরকারের নীতির মধ্যেই আছে। রাষ্ট্র এতে যথেষ্ট খুশি, কারণ জিডিপি

বাড়ছে। যারা ধনিক শ্রেণি তারাও খুশি। কিন্তু এটার যে পরিণতি মানুষের উপর পড়ছে, অনেক মানুষ উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, অনেক মানুষ কাজ হারাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের মনোযোগ নাই। আর একটা হচ্ছে পরিবেশগত প্রভাব। মানুষ এবং পরিবেশ, দুই-এর ওপরই আক্রমণ আসছে। কিন্তু কিছু লোক এতে ব্যাপক লাভবান হচ্ছে।

দেশে এত ব্যাংক দরকার নাই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারের এবং যারা হঠাৎ করে ব্যাংক তৈরি করে তাদের এতে ব্যাপক আগ্রহ। ব্যাংকের পরিচালক হয়ে মানুষের যে জমানো টাকা সেটা মেরে দিচ্ছে। নিজেদের মধ্যে নানারকম ভাগবাটোয়ারা করছে। আবার সরকার তাদের ক্ষমতাও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকার ঋণখেলাপীদের নানা রকম সুবিধা দিচ্ছে। আজকে পত্রিকায় দেখা গেছে যে, বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক থেকে বেস্কিমকো-কে বাইশ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে। যদিও তাদের পাওয়ার কথা না, নিয়মের মধ্যে নাই। বেস্কিমকোর টাকা পয়সার অভাব নাই, কিন্তু তারা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক থেকে ঋণ নিবে। এখান থেকে নিলে তাদের জন্য সুবিধা। আবার প্রাইভেট ব্যাংকের জামানত থেকেও নানারকম ভাগবাটোয়ারা চলে। অর্থাৎ ঋণখেলাপী এবং ব্যাংক পরিচালকদের নানা ধরনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যেমন মেয়াদ বাড়ানো, একই পরিবারের অধিক সংখ্যক পরিচালক রাখা, ব্যাংক বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ আমলে না নেওয়া। অর্থাৎ ব্যাংক পুঁজি বাড়ানোর ও পুঞ্জিভবনের এবং সর্বোপরি দ্রুত ধনী হওয়ার একটা মাধ্যম। এর একটা প্রভাব আছে। আবার এই টাকাটা দেশের বাইরে ডলার হিসাবে পাচার হয়। গার্মেন্টস ও প্রবাসী শ্রমিকরা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চল্লিশ বিলিয়ন ডলার পার করেছে। সেটা নামতে নামতে এখন তেইশ-চব্বিশ বিলিয়ন হয়েছে। এক বিলিয়ন মানে একশ কোটি, তাহলে এত বিলিয়ন ডলার যে হাওয়া হয়ে গেল সেটার একটা বড় কারণ টাকা পাচার। এর পাশাপাশি কিছু মানুষের সুবিধার জন্য বিদেশ থেকে ঋণ করা হয়েছিল। এই দুটোর ফলে টাকা কমে গেছে।

সেদিন একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেছেন, ‘দুর্নীতি নিয়ে এত কথা বলার কিছু নাই। কিছু মানুষ দুর্নীতি করবেই বা ধনী হবেই, এতে ঈর্ষার তো কিছু নাই।’ কিন্তু প্রতিটি দুর্নীতি যে আরও বহু মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং প্রাণ, প্রকৃতি ও মানুষের উপর এগুলোর মারাত্মক পরিণতি আছে ও চাপ

হবে, এটা বোঝার ক্ষমতা যাদের থাকে না, তারা যদি চিন্তার জগতকে প্রভাবিত করে, তাহলে তো এই ধরনের বিপদ আসবেই। এর পাশাপাশি নিয়োগ বাণিজ্য ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। দেখা যায় যে সরকারি ছাত্র সংগঠনের পদ বা যে কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে যে টাকা দিতে হয়, এতটা ভয়াবহ কখনও ছিল না, যেটা এখন হচ্ছে। যে কোন ধরনের চাকরী পেতে গেলেই হিসাব করতে হয় যে কত টাকা লাগবে। টাকা পয়সা ছাড়া চাকরি হলে সেটা একটা বিরাট ব্যতিক্রমের ঘটনা। এর ফলে কিছু মানুষ বিপুল টাকার মালিক হচ্ছে এবং সম্পদ ও পুঁজির পুষ্টিভবন হচ্ছে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সকলে।

বিনোদ কপ্তি (প্রজেক্ট ম্যানেজার, দক্ষিণ এশিয়া অফিস, দিল্লী, রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং): This is such a difficult time and it is happening everywhere. The way the jobs are precarious in unorganized sector, labor organizations are not covered many aspects and exploitation is being happening in our countries. The capitalists or rich families are united and all the international forums be it WTO or be it climate change negotiations or be it anything are dominating by them. The gap between rich and poor are widening a lot. This is a very fertile ground for movement, but that is not happening. The way the population is busy struggling with their issues of existence and the way the right wing politics are engaging us in the politics of hate in the issues of identity and religion. All these factors are very difficult to comprehend and we all need to think and act on how we can get clear understanding on class and a clear understanding of who our enemy is. Now there are not a single face of enemy as rightly pointed out. For example police and state and sometimes is the manifest the problems, but the real enemy lies somewhere else. So we need to understand the power of coming together and in a such a difficult time it becomes everyone's responsibility on how to make these contradictions understandable to the common people.

(এটি একটি কঠিন সময় এবং এ ধরনের ঘটনা সর্বত্র ঘটছে। অপ্রতিষ্ঠানিক খাতের কাজের ধরন অনিরাপদ ও অনিশ্চিত এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো এসব

ইস্যু তাদের কাজে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে না। ফলে শোষণ অব্যাহত আছে। পুঁজিপতি বা ধনী পরিবারগুলি নিজেরা একাটা থাকে এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক ফোরাম, হোক তা WTO, হোক তা জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনা, হোক তা যে কোনও কিছু, সবকিছুতেই রয়েছে তাদের আধিপত্য। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেক বেড়ে যাচ্ছে। আন্দোলনের এটি উপযুক্ত পরিস্থিতি, কিন্তু আন্দোলন হচ্ছে না। একদিকে জনগণ নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রামে ব্যস্ত এবং আর অন্যদিকে ডানপন্থী রাজনীতি আমাদেরকে আত্মপরিচয় ও ধর্মের ইস্যুভিত্তিক ঘৃণার রাজনীতিতে ব্যস্ত রেখেছে। এই বিষয়গুলো বোঝা খুব সহজ নয় এবং আমাদের সকলের চিন্তা এবং কাজ করা দরকার যে কিভাবে আমরা শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি এবং কে আমাদের শত্রু সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি। এখন শত্রুর কোন একক অবয়ব নেই, যা এই আলোচনায় সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পুলিশ এবং রাষ্ট্র কখনও কখনও প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতীয়মান, কিন্তু প্রকৃত শত্রু অন্য কোথাও ঘাপটি মেরে থাকে। তাই আমাদেরকে একতাবদ্ধ হওয়ার শক্তিকে বুঝতে হবে এবং এমন এক দুঃসময়ে কীভাবে এই দ্বন্দ্বগুলো সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করা যায় তার দায়িত্ব সকলের।)

ড. মোঃ নাজিম উদ্দিন (সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বারি): আপনি বলছেন ব্রিটিশ উপনিবেশের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রও প্রায় উপনিবেশ ছিল। কেন পাকিস্তান পর্যায়কে 'প্রায়' উপনিবেশিক বলছি?

আনু মুহাম্মদ: পাকিস্তান পর্যায়কে প্রায় উপনিবেশিক বলার কারণ হচ্ছে, উপনিবেশিক বললে তো একটা উপনিবেশিক কেন্দ্র লাগবে। এছাড়া একটা কাঠামো থাকা লাগবে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পাকিস্তান নিজেই উপনিবেশ। জন্মের পর থেকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে যে ভূমিকা পালন করার কথা সেটা হয়নি, এটা পাকিস্তানের জনগণের জন্য একটা ট্রাজেডি। সেখানে কোন প্রতিষ্ঠান বা নির্বাচন কাজ করেনি, সেনাবাহিনীই সমস্ত কিছু। সিভিল, মিলিটারি এবং বিপুল বিভূক্তির মালিক কিছু পরিবারই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে। জন্মের পর থেকে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশাল সার্ভিস দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ হয়েছিল। যেমন এখন আবার একটা পুনর্নির্মাণের চাপ তৈরি হচ্ছে। সেসময় ব্রিটেন ছিল

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্র, যা শিফট করে চলে গেল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। ১৯৪৫ সালের পর এশিয়ায় তারা নানা রকম চুক্তি করেছে। সেসময় পাকিস্তান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় জায়গা। ফলে সেখানে কোন কিছু দাঁড়াতে পারেনি। মিলিটারি ও ব্যুরোক্রেসি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুব সুবিধাজনক। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র নিজেই একটা নয়া ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু এই কাঠামোতে বাংলাদেশকে সেও ব্যবহার করেছে উপনিবেশের মত, কিন্তু সে নিজেই উপনিবেশ এবং পুরোপুরি ঔপনিবেশিক শক্তি হওয়া তার পক্ষে সম্ভবই না।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রের মূল চরিত্র পুঁজিবাদী। ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে, তাহলে বাংলাদেশে কী করে এটা আমরা করতে পারি, এরকম অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। তবে বাংলাদেশে অনেক সামন্ত উপাদান আছে, যেমন যারা সরকারে বা ক্ষমতায় থাকেন তারা জমিদারী স্টাইলে কাজ করেন বা জমিদারের মত ভূমিকা পালন করেন, এইটা তো পুঁজিবাদের সাথে মেলে না।

তবে উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পর্ক এবং অর্থনীতির গতিশীলতার জায়গাগুলো দেখে বলা যায় অবশ্যই এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। তবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে এটি অবস্থিত। পুঁজিবাদ বিকাশের সময় ইউরোপের কোন মুরব্বি ছিল না, সে নিজে স্বাধীনভাবে তার বিকাশ করেছে, কিন্তু বাংলাদেশ তো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা, তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারা ক্ষমতায় বা সরকারে আসবে না আসবে তাতে কিছু পরিবর্তন হয় না। বাংলাদেশ আগামী ত্রিশ বছর কিভাবে চলবে তার কাগজপত্র সব প্রস্তুত আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নদী বিষয়ক সকল চুক্তি, নীতিমালা, সব চুক্তি ও প্রস্তুতি সম্পন্ন। এরকম একটা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি।

উপনিবেশ থেকে সম্পদ লুট করে ইউরোপের পুঁজিপতিরা নিজের দেশে জমা করেছে। আর বাংলাদেশের পুঁজিপতিরা এই দেশ থেকে সম্পদ বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের সাথে বাংলাদেশের এটা এক মৌলিক পার্থক্য। এর কারণ আমরা একটা প্রান্তঃস্থ অবস্থানে এবং পোস্ট কলোনিয়াল অবস্থায় আছি। এজন্য আমি বলি প্রান্তঃস্থ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

পরিবহন শ্রমিকদের যে সমস্ত সংগঠন দেখা যায়, এগুলো আসলে মালিকদের সংগঠন। টার্মিনাল ঘিরে শত কোটি টাকার বাণিজ্য আছে। যে

দখলে রাখতে পারবে, সে এই টাকাটা পাবে। দখলদাররা শ্রমিকদেরকেই এসব কাজে ব্যবহার করে। দখল করে তারা শ্রমিকের কোন কার্যকরী সংগঠন গড়ে উঠতে দেয় না এবং শ্রমিকদের কোন অধিকারও নাই। গার্মেন্টসে কিছুটা পার্থক্য আছে। কিন্তু এখানেও এমন বেশ কিছু ট্রেড ইউনিয়ন আছে, যাদের সম্পর্ক আসলে মালিকদের সাথে। ফলে accord বা এলায়েন্স ধরনের বাইরের চাপ ছাড়া, ভেতর থেকে মজুরি বা নিরাপত্তাসহ অন্যান্য বিষয়ে যে ধরনের পরিবর্তন হওয়ার কথা, সেগুলো হয়নি। প্রকৃত আয় কমে গেলেও, গার্মেন্টসের শ্রমিকদের যতটুকু আয় বেড়েছে, প্রতিবারই আন্দোলন করতে হয়েছে এবং তারা যতবারই আন্দোলন করে, তখন মালিকরা একটা কথা বলে যে, মজুরি বাড়ালে গার্মেন্টস শিল্প আর বাঁচানো যাবে না, আর যারা আন্দোলন করছে তারা বিদেশী চক্রান্তের অংশ। কিন্তু বাস্তবে দেখি কখনও মজুরি বাড়ানোর পর গার্মেন্টসের উৎপাদন কমে। অর্থাৎ তাদের পুরো যুক্তিটাই হচ্ছে একটা অপপ্রচার। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রও তাদের সহায়তা দেয়। শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে গার্মেন্টস শ্রমিকরা অন্যতম। ফলে তাদের সংগঠিত করা অনিবার্য। এটা বাদ দিয়ে কোন কিছু হবে না। এই কাজটা হলেই সামনে কাজ করা যাবে। ইদানিং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং বা কন্ট্রাকটর সাপ্লাই দিচ্ছে, এরকম কাজ হচ্ছে। এতে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে যায়। সামনের দিনে যা আরও কঠিন হয়ে যাবে এবং শ্রমিকদের ভোগান্তি, বঞ্চনা ও নিপীড়ন আরও বাড়বে। সুতরাং এক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়া এবং মুক্তির আন্দোলনের নানা পথ ও পদ্ধতি সৃজনশীলভাবে বিকশিত করার জন্য বিভিন্ন মুখী চেষ্টা খুবই জরুরী।

পঞ্চম দিন : ২৪ আগস্ট ২০২৩

বাংলাদেশে ক্ষেতমজুর আন্দোলন ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব

সুরাইয়া বেগম : আজকের আলোচনার বিষয় “বাংলাদেশে ক্ষেতমজুর আন্দোলন ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব”। আজকের নির্ধারিত আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সাবেক সভাপতি এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বর শামসুজ্জামান সেলিম। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, তিনি গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ ইত্তেকাল করেছেন। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি। রিইব-এর পক্ষ থেকে আমাদের হৃদয় উৎসারিত গভীর শোক জ্ঞাপন করছি। ২০১৫ সাল থেকে রিইব এর কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন, যা আমাদের চিন্তা ও কাজকে সমৃদ্ধ করেছে। এই বিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ। আজকের আলোচক জনাব শামসুজ্জামান সেলিম সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অধ্যাপক এম এম আকাশকে অনুরোধ করছি। এরপর তাঁর ধারণকৃত বক্তব্য উপস্থাপন করা হবে।

এম এম আকাশ : শামসুজ্জামান সেলিম আমার রাজনৈতিক সহকর্মী। মৃত্যুর আগে তিনি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-র সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যদের বা প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মী। মুক্তিযুদ্ধের পর পাবনায় পাকসী নিউজপ্রিন্ট মিলে তিনি শ্রমিকের চাকরী নিয়েছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হলেও সেখানে তিনি সার্বক্ষণিক কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তার বিশেষ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতার প্রেক্ষিতে তাকে ঢাকাতে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে যুক্ত করা হয়। আশির দশকে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে ক্ষেতমজুর সমিতির কার্যক্রম তখন ক্রমে প্রসারিত হচ্ছিল। সেসময় তাদের মূল শ্লোগান ছিল “আড়াই হাত লাঠি ধর, জমি দখল কর”। সেসময় খাস জমি, পুকুর প্রভৃতি নিয়ে বিরাট উদ্দীপনা হচ্ছিল, যা নব্বই দশকে স্তিমিত হয়ে যায়। তখন শামসুজ্জামান সেলিমকে ক্ষেতমজুর সমিতির দায়িত্ব দেওয়া হয়

এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এর সাথে জড়িত ছিলেন। আশির দশকে ক্ষেতমজুরদের শ্রেণি সংগ্রামে জমির মালিকানার বিষয়টা ছিল প্রধান। কিন্তু খাস জমিগুলো দখল হয়ে যাওয়াতে সেই দাবি এখন অনেকটাই স্তিমিত, কারণ এসব খাস জমি উদ্ধার করতে গেলে রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষ করতে হবে। এছাড়া ক্ষেতমজুররাও সংঘবদ্ধ নয়। এই প্রেক্ষিতে তিনি সবসময় আমাদেরকে বলতেন যে, গ্রামীণ শ্রেণি কাঠামোতে নতুন যেসব পরিবর্তন হয়েছে, তার ভিত্তিতে ক্ষেতমজুর সমিতির নতুন কার্যক্রম নিতে হবে, যাতে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা যায়, কারণ গ্রামে পুঁজিবাদী কৃষি বা বাণিজ্যিকীকরণ অনেক বেড়ে গেছে। তিনি বেঁচে থাকলে তত্ত্ব ও বাস্তবতা, এই দুই জায়গাতেই আরও অবদান রাখতে পারতেন। তার মৃত্যু আমার, আমাদের দল, দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন এবং গ্রামীণ মজুরদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আজকে তাঁর ধারণকৃত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কী প্রশ্ন উত্থাপিত হল, তিনি সেটা শুনতে পারলেন না। আমি যতটা সম্ভব তার হয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।



শামসুজ্জামান সেলিম

সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সভাপতি
প্রেসিডিয়াম মেম্বর, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি

বাংলাদেশে ক্ষেতমজুর আন্দোলন ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব

শামসুজ্জামান সেলিম: গ্রামীণ মজুরদের সাথে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং অগ্রগতি জড়িত। তবে এটি আলোচনার জন্য দেশে বর্তমানে গ্রামীণ মজুরদের সংখ্যা বিবেচনা করতে হবে। পাকিস্তান আমলে দেশে ভূমিহীন কৃষক ছিল ২০ ভাগ। এই সংখ্যা ১৯৫০-এর দশক থেকে বাড়তে থাকে। গ্রামের জনগণের নিঃস্বকরণের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকের উদ্ভব। ১৯৭০ সালের দিকে গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৪০ ভাগের কাছাকাছি চলে গেলো। ১৯৭২ এর দিকে এটা মোটামুটি ৪৫ ভাগ হয়। গ্রামে কৃষকদের ভূমিহীন হওয়ার প্রবণতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এর মধ্যেই ১৯৭৪-এ দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটে এবং এরপর ভূমিহীনের সংখ্যা একলাখ বেড়ে যায়। এভাবে ভূমিহীন কৃষকের হার প্রায় ৭৪% শতাংশের কাছাকাছি হয়ে যায়। একটা বিরাট জনগোষ্ঠী! তখন এই শ্রেণির মানুষদেরকে সংগঠিত করা ছিল সময়ের

দাবি। কৃষক সংগঠন এবং কৃষক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেজন্য ১৯৮১ সালের ১৮ই মার্চ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কৃষক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পরে এদের কাছে খাসজমির দাবি ছিল জনপ্রিয়। ১৯৮৮ সাল নাগাদ এই আন্দোলনটা তীব্র রূপ নেয়। লক্ষ লক্ষ কৃষক মজুরের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং আন্দোলন গড়ে তোলে। এসব আন্দোলনে ১২ জন নেতা এবং কৃষক-মজুর শহিদ হন। কিন্তু এরশাদ সরকারের পতনের পর এটা ভেঙে গেলো। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রেশনিং দেওয়াও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

সেসময়ে যারা গ্রামীণ মজুর ছিল, তারা বাস্তবে দাসশ্রমিকের মতো ছিল। আর এসব মজুরের জন্য পারিবারিক জীবন ও অধিকারের প্রশ্নগুলো ছিল। এছাড়া সেসময় বিশেষ করে আশ্বিন-কার্তিক মাসকে বলা হতো মঙ্গার মাস। শব্দটা এখন বাংলাদেশে অনেক বেশি উচ্চারিত হয়। তখন আশ্বিন-কার্তিক মাসে ভূমিহীন মজুররা অগ্রিম শ্রম বিক্রি করে দিতো। তাদের দৈনিক মজুরি তখন হতো ১৫-২০ টাকা। কিন্তু ফসল কাটার মৌসুমে সেসব শ্রমিকের মজুরি ছিল ৬০ টাকা। এমনকি ১০০-১৫০ টাকাও হত। কিন্তু অগ্রিম শ্রম বিক্রেতারা এই সময়ও ২০ টাকা মজুরিতেই কাজ করতে বাধ্য হতো। এটা ভয়াবহ শোষণ। এই জীবনটা অনেকটা ছিল দাস জীবনের মতো। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়েও এই ধারা অব্যাহত ছিল। সেসময় ক্ষেত-মজুর আন্দোলন প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম। আর ওনার সাথে একদল তরুণ নেতা ছিলেন। তাদের মধ্যে খন্দকার আবুল, জিয়াউল মারুফ, মাওলানা আফসার আলী, সুকুমার ঢালী এরকম ছিলেন। আমি এখানে যাদের নাম বললাম, তারা প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আন্দোলনটা করেছেন। এরা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। খন্দকার ফারুক ঐসময় ৩৬৫ দিনের মধ্যে টানা ২৪২ দিন গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে আমাদের বিজ্ঞানেরা তখন বলতেন, আধাসামন্তবাদী আর আধাপুঁজিবাদী। অর্থাৎ পুরোপুরি সামন্তবাদও না, আবার পুঁজিবাদও না। ১৯৯০-এর দশকের শেষে একটা ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। গ্রামের অর্থনীতি শতভাগ পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়। এতে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল। উৎপাদন প্রণালী ১০০ ভাগ পুঁজিবাদ হলে উৎপাদন সম্পর্ক তো পরিবর্তন হবেই। সেটা থেকে

আমরা বলতে পারি যে, গ্রামীণ মজুর, ক্ষেতমজুরদের জীবন এখন দাস শ্রমিক থেকে ক্রমেই আধুনিক শ্রমিক হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বর্তমানে গ্রামীণ মজুরের সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। এরা কৃষি, অকৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত কাজে শ্রম দেয়। গ্রামীণ অর্থনীতির এই তিনটা স্তরের মধ্যে যারা কৃষির সাথে একেবারে সরাসরি জড়িত, আমরা তাদেরকে বলি ক্ষেতমজুর। এর মধ্যে শাক-সবজির আবাদ বেড়ে গেছে। তবে গ্রামের মধ্যে আরো মজুর আছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতি এরা সবাই গ্রামীণ মজুর।

আমি ক্ষেতমজুরদের নিয়ে বলি। এটা নিয়ে বলতেই আমি আগ্রহী। এই যে গ্রাম-জীবনের কৃষি অর্থনীতির একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে, এতে প্রথমে কেউ মনোযোগী হয়নি। ১৯৯৯ সালের দিক থেকে দেখা গেল যে, একই সাথে কয়েকটি ঘটনা ঘটলো। অবকাঠামোগত উন্নয়ন অর্থাৎ প্রচুর রাস্তাঘাট ইত্যাদি হল। যাতায়াত তখন আগের চাইতে সহজ হয়। এই সময়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে দেখা গেল, মজুরদের কেউ সরাসরি ভাড়া করছে না। আগে গ্রামে কৃষকরা সরাসরি মজুর ভাড়া করতেন। এখন তা করেন না। তারা এখন একজন সর্দারকে নিয়োগ করেন এবং তার সাথে চুক্তি করেন। এই সর্দার প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজুর নিয়োগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ ৩০ শতাংশ জমির ধান কাটা, মাড়াই করানোর জন্য সর্দার শ্রমিক নিয়োগ করলো। এটা শুরু হয় কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকেই। এটার রূপটা এখন পরিপূর্ণতা পেয়েছে। এর সাথে আরেকটা পরিবর্তন ঘটলো, সেটা হচ্ছে যাদের জমি বেশি আছে, তারা উৎপাদকদের কাছে জমি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। তারা নিজের থেকে কৃষিতে কোনো বিনিয়োগ করছে না।

এখানে একটু আলাদা করে একটা কথা বলা দরকার, সেটা হচ্ছে, অর্থনীতিবিদরা বলতেন কৃষকরা কয়েক ভাগে বিভক্ত— ধনী কৃষক, মধ্য কৃষক, গরীব কৃষক, প্রান্তিক কৃষক। প্রান্তিক কৃষক হচ্ছে যাদের ০.৫ একর থেকে ২.৫ একর পর্যন্ত জমি আছে তারা। যাদের ২৪ বিঘার উপরে জমি আছে তারা মধ্যধনী কৃষক। আর উৎপাদক কৃষক মানে আসলে প্রান্তিক বা গরীব কৃষক, যারা মাঠে কাজ করে। এরা ধনী কৃষকদের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে নিচ্ছে। ভাড়া নিয়ে তারা উৎপাদন করছে। এই ধারাটাই পুঁজিবাদ। এর ফলে যে পরিবর্তনটা হলো, আমাদের মজুরদের জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটছে। তারাও চুক্তিবদ্ধ হয়ে শ্রমশক্তি বিক্রি করছে। আমার

মতে বাংলাদেশের এই সিস্টেমটা দক্ষিণ এশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পাওয়া যাবে না।

এই যে ধনী কৃষক বা মধ্য কৃষক, এদেরকে এখন বলা যায় অনুপস্থিত ভূমি মালিক। এরা উৎপাদক কৃষকদের কাছে জমি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। তারা তো আর কৃষক না, তারা জমির মালিক। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের গ্রামে নানা ঘটনা ঘটছে, যেমন মুনাসা যেখানে বেশি পাওয়া যায়, সেই দিকেই উৎপাদক কৃষক বেশি মনোযোগী হচ্ছে। যেমন ধরেন মাছ চাষ, মুরগী পালন বা গরুর খামার গড়ে উঠেছে। এছাড়া এখন উৎপাদক কৃষকরা ধান রোয়া থেকে শুরু করে কেটে মাড়াই করা পর্যন্ত তার কত টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে সে সেটার হিসেব করে। সেজন্য সে এখন শ্লোগান দিচ্ছে যে, কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম চাই। অর্থাৎ সে এতটা বিনিয়োগ করেছে, তার পুঁজির টাকাটা সে তুলে নিতে চায়। এরকম একটা জায়গায় কিন্তু কৃষি অর্থনীতি পৌঁছে গেছে। এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদ। এখন গ্রামীণ মজুররা অবকাঠামোগত উন্নতির ফলে এক জায়গায় আবদ্ধ না থেকে সারা বাংলাদেশ চষে বেড়াতে পারে। আবার এর সাথে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপার আছে। এর ফলে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। নব্বই দশক পর্যন্ত আমাদের ক্ষেতমজুররা কার্তিক মাসে কাজের জন্য গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সে বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার পরিবারের সাথে দেখা-সাক্ষাতের কোন সুযোগ হতো না। পরে অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার আগে যখন সে বাড়ি ফিরতো, তখন সে কাজ করে যে অর্থ উপার্জন করতো সেটা নিয়েই সে বাড়ি ফিরতো। কিন্তু পুরো সময়টা তার স্ত্রী-সন্তানরা কি করছে, তার এটা জানার ক্ষমতা ছিল না। অথবা কেউ একজন কাজের জন্য যেয়ে মারা গেলেও তার পরিবার আশা নিয়ে বসে থাকতো যে সে কবে ফিরবে। এমনও ঘটনা দেখেছি নব্বইয়ের দশকে, কেউ কেউ পনেরো বছরও অপেক্ষা করে আছে তার মানুষটা কবে ফিরবে সে জন্য। হয় তার মৃত্যু ঘটেছে অথবা সে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বেঁধেছে। সে যা আয় করতো, সাথে সাথে তো আর বাড়িতে পাঠাতে পারতো না। তাকে টাকাটা সঙ্গে রাখতে হতো। তারা মানি অর্ডার বুঝতো না। আর এখন বিকাশ বা মোবাইল ব্যাংকিং আছে। এখন হ্যালো বললেই সে তার পরিবারে সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আবার উপার্জিত অর্থ

সাথে সাথেই তার পরিবারকে দিতে পারে। অর্থাৎ আগে পারিবারিকভাবে ধরলেও তারা দাস শ্রমিকের মতোই ছিল। সেই জায়গা থেকে তাদের এই জায়গায় আসায় বেশ উন্নতি হয়েছে। তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা তার পরিবারকে সময়মত অর্থ প্রেরণ, এসব আর কি। এর পাশাপাশি তারা শহুরে মজুর প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে গেছে। এমনকি শহুরে মজুররা পরিবার নিয়ে শহরেই থাকছে, সেখানেই কাজকর্ম করছে।

আমি যদি এখন মোটাদাগে বলতে চাই, তাহলে গ্রামীণ মজুরদের মূল স্বার্থের সংগ্রামটা কার সাথে? সেটা হচ্ছে, সে শ্রমশক্তি বিক্রি না করলে তার খাওয়া বা পরিবারের খরচ চলবে না। এখন সে তার শ্রমশক্তি কার কাছে বিক্রি করবে? গ্রামে যারা বিনিয়োগ করছে তাদের কাছেই। এখন কৃষক এবং অনেক কর্পোরেট হাউস গ্রামে জমি ভাড়া নিয়ে কিছু বিশেষায়িত ফসল আবাদ করছে, যেমন প্রাণ-এর মত কোম্পানির জন্য মশলা বা এ ধরনের ফসল। তাহলে এই মজুরদের স্বার্থটা হচ্ছে তার শ্রমশক্তি বিক্রি। তাকে সকাল-সন্ধ্যা কাজ করতে হচ্ছে। তার সরাসরি নিয়োগকর্তা হচ্ছে কৃষক। আর কৃষকের কাছে তার মজুরির প্রশ্নটা প্রথম চলে আসে। এই চেহারাটা আপনারা ইন্ডিয়ায় পাবেন না। বাংলাদেশে এটা খুবই স্পষ্ট, কিন্তু ওদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়।

এই বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জীবনে যা প্রয়োজন, সেগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি। এগুলো বেশিরভাগ নিশ্চিত করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। আবার কৃষকের সাথে মজুরির ব্যাপার তো আছেই। কিন্তু সরকার কি করতে পারে? এই মজুরদের সন্তানকে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে পাঠানো যেতে পারে রেমিটেন্সের জন্যে। তাদেরকে এই সুযোগটা দিতে পারে। আমাদের দাবি, সরকারি খরচেই তারা পাঠাক। পরে মজুরদের আয় থেকে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করবে। একেবারে ফ্রি হবে না। দ্বিতীয়ত, এদের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে রেশন। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামের উঠানামার ফলে তাদের নাভিশ্বাস অবস্থা। তরিতরকারি, চাল-ডাল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এত দ্রুত বাড়ছে যে মজুররা তাদের আয় দিয়ে সেগুলো কিনতে পারছে না। সুতরাং রেশনটা খুবই জরুরি। তারপরে তাদের একটা জরুরি দাবি হচ্ছে পেনশনের। সরকার এক ধরনের পেনশন পাশ করেছে। তবে সেটা খুবই বিতর্কিত।

এটাতে বলা হয়েছে যে, ৬০ বছর বয়স হলে গ্রামের মজুরদের একটা পেনশন দেওয়া হবে, কিন্তু এজন্য বার্ষিক প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে।

অন্যদিকে গ্রামীণ মজুরদের জন্য সারা বছর কাজ পাওয়াটাও খুব জরুরি। কিন্তু এই খাতে খুবই অস্থিরতা বিরাজ করে। ধান কাটার মৌসুমে কৃষক খুবই চিন্তায় থাকে, যাতে বন্যা আসার আগে ধান কাটার কাজ শেষ করা যায়। তাদের খুব তাড়া থাকে এবং খুব দ্রুত তারা ধান কাটতে চায়। এছাড়া সেইখানে শ্রমের চাহিদা ও যোগান নিয়ে তারা চিন্তায় থাকে। কৃষকের সাথে মজুরের রয়েছে সামাজিক সম্পর্ক, ফলে সে বেশি দরকষাকষি করতে পারবে না। তবে যখন শ্রমের চাহিদা খুব বেশি থাকে, তখন সে মজুরি কিছুটা বাড়িয়ে নেয়।

আমাদের বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গে মঙ্গা হয়। তবে এদের এখন সুবিধা হচ্ছে, কাজের জন্য তাদেরকে বাইরে অনির্দিষ্টভাবে হাট্টাটা করা লাগে না। বিভিন্ন অঞ্চলে তারা আগেই কন্ট্রাক্টে কাজ নিয়ে নেয়। কাজ শেষে তারা মজুরি এবং বোনাস নিয়ে চলে আসে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ ঢোকান ফলে সেখানে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সারা বাংলাদেশেই এই অবস্থা। এখন গড় মজুরি কত? আমরা দেখেছি এই মজুরদের গড় মজুরি ৩৫০-৪০০ টাকার বেশি হয় না এবং সারা বছর এই মজুরি পাওয়াও যায় না। আর এখন তো খুবই কষ্ট, কারণ চালডাল বা তরিতরকারির বাজারের অবস্থা খুবই সংকটপূর্ণ। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় একটা কর্মসূচি চালু হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি। এটা সেপ্টেম্বর-নভেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বা মজুর শ্রেণীর জন্য ত্রাস্তিকালে চালু হয়েছিল।

এখন উৎপাদন সম্পর্ক বা শ্রেণি সম্পর্কের কথা যদি বলেন, তাহলে গ্রাম জীবনে শ্রেণি সম্পর্ক কী রকম, কার সাথে কার সম্পর্ক? কৃষকের সাথে মজুরির সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়গুলো কী?

কৃষকের সাথে মজুরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মজুরিই প্রধান। মজুরের দরাদরির জায়গাটা মূলত কৃষকের সঙ্গে। এছাড়া আরও নানা ধরনের দ্বন্দ্ব তো আছেই। এর মধ্যে নীতিগত দ্বন্দ্ব কোনটা? সেটা হচ্ছে মজুরির বিষয়টা, শোষণের বিষয়টা। এর পাশাপাশি জাতীয়ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বও আছে। বাংলাদেশে ধনীক শ্রেণীর সাথে শাসক শ্রেণী মিলিত অবস্থানে আছে। এরাই শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বড় শত্রু। শ্রমিক শ্রেণী মানেই হচ্ছে শোষিত মানুষ

বা শোষিত শ্রেণী। এইটা শহর এলাকায় একরকম, গ্রামজীবনে আবার আরেক রকম। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে বা এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্যে একটা জাতীয় সরকার দরকার।

মজুর শ্রেণি মানে বিশাল একটা জনগোষ্ঠী। গ্রামে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি, আর শহরে প্রায় দুই কোটি। আর কেরানি-কর্মচারি সব মিলিয়ে প্রায় ১১ কোটি হবে। ১৮ কোটি জনগণের মধ্যে ১১ কোটি প্রতিদিন শ্রম বিক্রি করে সংসার চালায়। এদেরকে পরিশ্রম করে পরিবার চালাতে হয়। তাহলে সরকারকে এমন হতে হবে, যেন এই জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে থাকে।

গ্রামে কৃষকই শ্রমিক নিয়োগ বা মজুর ভাড়া করে। আর মজুরের প্রধান লড়াইটা হচ্ছে মজুরি নিয়ে, তার জীবনমান যাতে বজায় থাকে এবং উন্নত হয়, সেই পরিমাণ মজুরি সে চায়। বাংলাদেশে যারা অর্থনীতির চর্চা করেন তাদের কাছে মজুরির একটা সংজ্ঞা আছে। এখন কৃষকরা ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপাদনের সাথে জড়িত। এছাড়া আছে ফল বাগান, পুকুরে মাছ চাষ এবং খামারে মুরগী, ডিম, দুধ ও মাংস। এরা ধনী কৃষক এবং অনেক বেশি টাকা বিনিয়োগ করে। এখানে আরও অধিক শ্রমিক দরকার। অর্থাৎ এখন কৃষকও একটা সংকটে আছে।

বাংলাদেশের বর্তমান শাসকশ্রেণীকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। আবার তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্যে যারা আন্দোলন করছে তারাও তো একইরকম। ক্ষমতায় গেলে একই কাজ করবে। এদের কাছে মজুরের বা মানুষের স্বার্থের কোন দাম নাই। অন্যদিকে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের লাভজনক দাম চাইছে। ফসলের দাম নির্ধারিত হয় বাজারে। কিন্তু তার কাক্ষিত দাম সে পাচ্ছে না। সেখানে সে বঞ্চিত হচ্ছে। এই জায়গাটায় কৃষকের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। এরা ফসলের মৌসুমের শুরুতেই কম দামে কৃষকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে পরে বেশি দামে বিক্রি করে। এখন বাংলাদেশে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে আধুনিক বড় বড় রাইস মিল। এসব মিলাররা লক্ষ লক্ষ টন ধান কেটে নিচ্ছে। এখন কৃষকের স্বার্থটা যদি না দেখা হয়, তাহলে কিন্তু মজুরকে সহায়তা করতে পারবে না। সুতরাং কৃষক সমিতি কৃষিপণ্যের লাভজনক দামের একটা দাবি তুলতে পারে। তাদের সাথে এই লড়াইয়ে আমরা ক্ষেত্রে মজুর সমিতি সমর্থন জানাতে পারি।

এছাড়া সেচের পানি নিয়েও শোষণ জারি আছে। গ্রামে প্রতি বিঘায় পানি সেচের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিতে হয়। পানিওয়ালারা জমির যেখানে সবচেয়ে বেশি ধান হয় সেখানকার মাপে ধান কেটে নেয়। এই ওয়াটার লর্ডদের আধিপত্য থেকে বাঁচতে সমবায় লাগবে।

এছাড়া কৃষিকে কেন্দ্র করে আরও যেসব শোষণ আছে, সেখানে কৃষকের লড়াইয়েও আমরা ক্ষেত্রে মজুর সমিতি তাদেরকে সমর্থন করতে পারি। কিন্তু শেষ বিচারে তারা হচ্ছে মজুর। কৃষক তো বাজারে পণ্য বিক্রি করে মুনাফা পায়। মজুর তো মজুরি ছাড়া কিছুই পায় না। তাহলে মজুরির লড়াইটা বা দরাদরি তো কৃষকের সাথেই করতে হবে। অর্থাৎ মূল বা নীতিগত দৃষ্টান্ত কৃষকের সাথে বা নিয়োগ যে করেছে তার সাথে। আর শহর এলাকায় এটা অনেক বড় বিষয় এবং সেখানে কোন কথাই বলা যায় না।

কিন্তু কৃষকের সংজ্ঞা কী হবে? দেখা গেল একজন কৃষক একই সাথে আবার মজুরের কাজ করে। এখন অনুপস্থিত ভূমি মালিকরা তাদের জমি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে এবং সেই জমিটা ভাড়া নিচ্ছে গরীব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা। তারা চাষবাস করছে, আবার একই সঙ্গে কোনো কোনো সময় মজুরিও করছে। তাহলে কৃষক কাদেরকে বলবো, আর মজুরই বা কাদেরকে বলবো?

মজুর হচ্ছে সেই মানুষ যে শ্রমশক্তি ভাড়া দেয়। সে শ্রমশক্তি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করে। আর কৃষক তার পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন করছে। তারপর বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছে। সেখানে লাভজনক দাম নিয়ে সে জীবন নির্বাহ করছে। কিন্তু কিছুদিন পর যদি সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন সে মজুরে পরিণত হয়। তবে এখন আর এমন নাই। কৃষক থেকে মজুর হয়ে যাওয়ার ধারা আর আগের মতো নাই। ইন্ডিয়ায় একটা সময় বিরাট কৃষক আন্দোলন হতো। লক্ষ লক্ষ কৃষক একটি জায়গায় চলে আসতো এবং তাদের দাবি আদায় করে নিতো। আমাদের বাংলাদেশের কৃষকরা এখন পর্যন্ত সংগঠিত না, সচেতনও না। তবে অনেকটাই নির্ভর করে সংগঠকদের উপর। এখন মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কী করতে হবে, সেই কর্মসূচি তো সংগঠকদের নিতে হবে। বাংলাদেশে এটা একজন করেছিল। প্রায় ১৫ বছর আগে গাইবান্ধায় এই আন্দোলনটা হয়েছিল। মিহির ঘোষ নামের ক্ষেত্রে মজুর সমিতির এক নেতা গাইবান্ধা থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যুবলীগ প্রচণ্ড হামলা করে। অর্থাৎ এই লড়াইটা এতো সহজ না। এটা একটা কঠিন শ্রেণি সংগ্রাম এবং এটাই প্রকৃত শ্রেণিসংগ্রাম। এছাড়া শ্রেণিসংগ্রাম আবার কোনটা? আমাদেরও এখনকার শ্রেণিসংগ্রামে গ্রামে ক্ষেতমজুরদের মজুরি ঠিক করা ও মজুরি আইন দরকার। সাম্প্রতিক সময় আমাদের এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার গ্রামীণ মজুরদের শ্রমিক হিসাবে একটা বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার আমরা পাচ্ছি না। আমরা চাই আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারটা নিশ্চিত করা হোক। তাহলে এই অসংগঠিত শ্রমিকদেরকে আমরা আরো ভালোভাবে সংগঠিত করে গ্রাম জীবনের পুনর্গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারি। শ্রম আইনের ভেতরে এদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে।

আমরা সরকারের কাছে ট্রেড ইউনিয়নের জন্য অনেক আবেদন করেছি, কিন্তু কাজ হয়নি। এটার দায়িত্বে যে সংসদ সদস্য ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যতই আবেদন করেন, আমরা আর এর বেশি যাব না। সুতরাং এটার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এটা আদায় না করতে পারলে হবে না। আমরা ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার চাই। ইন্ডিয়াতে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার আছে, তাহলে আমরা বাংলাদেশে কেন ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার পাব না?

এছাড়া আমরা ন্যূনতম মজুরির জায়গাটা ঠিক করতে পারি। গ্রামের মজুরদের সর্বনিম্ন মজুরি কত হবে? যখন মজুরের কাজ প্রয়োজন তখন কম মজুরি দিলেন, আবার যখন কৃষকের প্রয়োজন তখন বেশি দিলেন। কিন্তু একটা ন্যায্য মজুরি মজুরদের জন্য আবশ্যিক। এছাড়া শ্রমিকের সংখ্যা আরেকটা বড় সমস্যা। আবার নারী এবং পুরুষ ক্ষেতমজুরদের জন্য আলাদা মজুরি রয়েছে। একই কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিক যদি ১০০ টাকা পায়, নারী শ্রমিকদেরকে দেওয়া হচ্ছে ৬০ টাকা। আমরা এই বৈষম্যের অবসান চাই। নারী ও পুরুষের সমান শ্রম, মজুরিও সমান হবে, এই বৈষম্যটা বন্ধ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমিকদেরকে প্রসূতিকালীন সময়ে রাষ্ট্রকে সহায়তা করতে হবে। আর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে কথা বলা হয়, সেটা কোথা থেকে আসলো? শহরের কলকারখানার যে অবদান রয়েছে, তার পাশাপাশি কৃষির বিরাট একটা অবদান আছে। কৃষি শ্রমিকদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা ন্যায্য হতে হবে। তাহলে আমাদের পুরুষ শ্রমিকদেরও উন্নতি হবে, নারী শ্রমিকদেরও উন্নতি হবে।

মুক্ত আলোচনা

মোঃ ইফতেখার আলী (প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব): বিগত বছরগুলোতে রিইব-এর বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানে সেলিম ভাই এর বক্তব্য থেকে কৃষি ও শ্রমিকদের বিষয়াদি বুঝতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি আমাদের সময় দিয়েছেন। বুলগেরিয়াতে উচ্চ শিক্ষা নিয়েও তিনি দেশের কারখানায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন। আজকেও তার বক্তব্য ভাল লেগেছে। বর্তমান সরকার ক্ষেতমজুর সমিতির দীর্ঘদিনের দাবি পেনশন চালু করেছে। কিন্তু এটা এমনভাবে চালু করা হয়েছে যাতে মানুষকে প্রতি বছর প্রিমিয়াম বা কিস্তী দিতে হবে এবং ষাট বছর বয়স হলে পেনসন পাওয়া যাবে। বেসরকারি কোম্পানির বীমার মত এরকম একটা বিষয় তো জনগণ বা ক্ষেতমজুররা চায়নি। এটা সেলিম ভাই খুব সুন্দর করে তুলে ধরলেন যে, ষাট বছর বয়স হয়ে গেলে একজন ক্ষেতমজুরকে পেনসনের আওতায় আনতে হবে এবং এজন্য তার নিয়মিত প্রিমিয়াম দিতে হবে না, এই দাবীটা বর্তমানে চালুকৃত পেনসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়নি। এই প্রিমিয়ামের টাকাগুলো দিয়ে কিভাবে আরও লাভ করা যায়, এটা হয়তো সরকারের মূল লক্ষ্য। এছাড়া ক্ষেতমজুরদের এখন কৃষি শ্রমিক বলা হচ্ছে। এখন খাদ্য গ্রহণও যেহেতু কৃষির অন্তর্ভুক্ত, সেক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থার সাথে জড়িত শ্রমিকরাও কৃষি শ্রমিকের আওতায় চলে আসতে পারে। সেলিম ভাই এর কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। রিইব এর কাজে বা ব্যক্তিগত গবেষণার কাজে যখন উনার সাথে যোগাযোগ করতাম, তখন এত সুন্দর করে তার বক্তব্য তুলে ধরতেন, যে বিষয়গুলো বুঝতে খুব সুবিধা হত। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে একজন বিজ্ঞ মানুষকে আমরা হারিয়েছি।

বিগত কয়েকদিনের আলোচনায় আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের দেশে পুঁজিবাদের বিকাশটাকে সমাজবিদ ও অর্থনীতিবিদরা বিভিন্নভাবে নামকরণ করেছেন, যেমন ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ, চোরাই বা লুস্পেন অর্থনীতি, রেন্ট সিকিং অর্থনীতি। অর্থাৎ এক ধরনের বিকৃত ও শোষণমূলক পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা অজনগণে পরিণত হয়েছি বা নাগরিক অধিকারবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। একজন মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য বহু রূপী হতে হচ্ছে, কখনও কৃষক, আবার কখনও মজুর, আবার কখনও দোকানদার, কখনও ইটভাটা শ্রমিক বা অন্য নানা কিছু। এর

ফলে ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী লাভবান হয়েছে এবং সকলের মধ্যে ভোগবাদ চরমভাবে ছড়িয়ে গেছে। এর ফলে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে গেছে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়, যেমন ব্যক্তিগত গাড়ি বা দামি গ্যাজেট ইত্যাদি। এগুলো কিনতে বিদেশী ডলার লাগে, অথচ আমাদের ডলার সংকট চলছে। কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে এগুলো লাগে। আমাদের সার্বিক সামাজিক অবস্থা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে জনগণের টাকায় আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি তৈরি করে পুঁজিপতিদের কাছে তুলে দিচ্ছি এবং তারা এদেরকে সুন্দর করে ব্যবহার করছে। কিন্তু যেই মজুরের টাকায় তাদের লেখাপড়া হয়েছে, তাদের অধিকার কাঠামোগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। পুঁজিপতি ও ক্ষমতাবানরা যখন রাস্তা দিয়ে বিকট শব্দে হর্ণ বাজিয়ে গাড়ি চালিয়ে যান, তখন নিজেদেরকে আসলেই অজনগণ মনে হয়। কীটনাশক বিষ দিয়ে আমাদের মেরে ফেলতে পারলেই হয়তো তাদের জন্য সুবিধা হত। বাজারটা চালু রাখার জন্য হয়তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। অর্থনীতির এই বিকৃত রূপগুলো নিয়মিত খবরের কাগজে দেখা যায়, গবেষকদের লেখায় এসব বিষয় উঠে আসে, কিন্তু কার্যকর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। এজন্য আমাদের কাজের পরিসর আরও বাড়াতে হবে। বিশেষ করে যারা তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকরা এত ব্যস্ততা বা স্ট্রেসের মধ্যে থাকেন যে তার মধ্যে লড়াই-সংগ্রামের স্বপ্ন দেখা কঠিন হয়ে যায়। এছাড়া তার কাজ শেষ হওয়ার পর ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে তার কাছে এতরকম বিনোদন চলে যায় যে, সে একটা চক্রের মধ্যে পড়ে যায়। তবে এই চক্রটা আমরা বিগত কয়েকদিনের আলোচনায় জানতে পেরেছি। এজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা মানুষের দায়িত্বটা বেশি। এই বিভ্রান্তিকর চক্রের বিরুদ্ধে যেসব ছোটবড় উদ্যোগ আছে সেগুলোকে সহায়তা করা দরকার।

বিনোদ কপ্তি: রিইব-আরএলএস যখন কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করে, তখন থেকে শামসুজ্জামান সেলিমের সহায়তা আমরা পেয়েছি। তার সাথে আমার যতবার দেখা হয়েছে, প্রতিবারই আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। আমি আনন্দিত যে, এই আলোচনার মাধ্যমে তার শেষ চিন্তাভাবনা তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। আশা করি তার স্বপ্ন পূরণ হবে।

চৈতন্য কুমার দাস (গবেষণা সহকারী, রিইব, সাতক্ষীরা): আমি নিজেও আগে ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করেছি। এখানে নারী ও পুরুষের মজুরি বৈষম্য প্রকট। এখন কৃষি বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে এবং কৃষি শ্রমিকদেরও তার সাথে তাল মিলাতে হচ্ছে। কিন্তু নারী ও পুরুষ কৃষি শ্রমিক উভয়েই নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। ইটভাটায় কাজের ক্ষেত্রে তাদের সর্দার বা গ্রামে কাজের ক্ষেত্রে দালালরা তাদের কাছ থেকে কমিশন কেটে নিচ্ছে। আবার সীমান্ত পার হয়ে ইন্ডিয়াতে কাজ করতে যাওয়ার সময় সেখানকার দালালদের শোষণের শিকার হচ্ছে। এছাড়া তারা যেহেতু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছোটছুটি করছেন, সেজন্য তাদের সংগঠিত করা আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাদের এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগেরও মারাত্মক অভাব।

নাভিদ আনজুম হাসান (ডকুমেন্টেশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার, রিইব, ঢাকা): জনাব শামসুজ্জামান সেলিম ভাইকে এই শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ধারণ করতে গিয়ে আমি জেনেছি। এটা ছিল আমার সৌভাগ্য। বিগত পাঁচটি আলোচনা শুনে আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সে বিষয়ে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করতে হবে। কারণ তাদেরকেই ভবিষ্যতে এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে যা সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে।

মোঃ আনোয়ার হোসেন (গবেষণা সহকারী, রিইব- বগুড়া): আজকের আলোচনায় যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, সেগুলো মাঠপর্যায়ে কাজ করতে খুবই সহায়ক হবে। বিশেষ করে খাস জমি, ন্যূনতম মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, মধ্যস্বত্বভোগীদের বিষয়গুলো সারিয়াকান্দি, বগুড়ার প্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। আগে আমি শ্রেণিসম্পর্ক বিষয়টা বুঝতে কঠিন লাগতো, কিন্তু এই পাঁচ দিনের আলোচনা আমাকে এই বিষয়টা বুঝতে সহায়তা করেছে।

মোঃ আবুল ফজল (সদস্য সচিব, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, সৈয়দপুর, নীলফামারী): কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে যুক্ত থাকার ফলে শামসুজ্জামান সেলিম মহোদয়ের সাথে আমার পরিচয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাথে উনার নিবিড় সম্পর্ক ছিল এবং সবসময়ই স্থানীয় পরিস্থিতির কথা জানতে চাইতেন। নীলফামারীতে একবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়

পাঁচ শতাধিক মানুষ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করেছিল। সেটা ছিল আশ্বিন-কার্তিক অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের মঙ্গার সময়। সেই কর্মসূচিতে ক্ষেতমজুরদের দাবিগুলো তুলে ধরা হয়েছিল। তখন থেকেই আমি ক্ষেতমজুরদের মজুরি, পেনশন প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলনের সাথে জড়িত।

সমাপনী বক্তব্য

সুরাইয়া বেগম: “বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক : তত্ত্ব ও বাস্তবতা” শিরোনামে বিগত পাঁচদিনের ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমরা দেশের শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়টাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। শ্রেণি সম্পর্ক এই বিষয়টা প্রথম উত্থাপন করেছিলেন কার্ল মার্কস। প্রথম দিন এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান। তিনি কৃষক সমাজের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শ্রেণি সম্পর্ক তুলে ধরেছিলেন এবং এর ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা করেছেন। এর পরদিন তাত্ত্বিক পরিসর ও বাস্তবতার দিক থেকে এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক এম এম আকাশ। অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে উৎপাদন সম্পর্ক ও পুঁজিবাদের বিকাশ ছিল তার আলোচনার বিষয়। তিনি শ্রেণি সম্পর্কের নানা দিগন্ত ও প্রেক্ষিত উন্মোচন করেছেন। ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা নারীবাদ তত্ত্ব ও বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি সমাজের বিভিন্ন ক্ষীণ কণ্ঠের বক্তব্যগুলো সামনে আনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। এর পরদিন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ-এর শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা, জনগণ এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির দায়িত্বের দিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে ধনী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক-মজুর শ্রেণির অবস্থান তিনি বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। ধনিক শ্রেণি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত হয়ে শ্রেণি বৈষম্যের যে জায়গাগুলো তৈরি করে সেগুলো তিনি আলোচনা করেছেন। আজকে শামসুজ্জামান সেলিম মহোদয়ের আলোচনায় ক্ষেতমজুর সমিতির সংগঠন, তাদের উত্থান ও অর্জন এবং বর্তমান কৃষি শ্রমিকদের অবস্থান উঠে এসেছে। তিনি কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে রাষ্ট্রকে ভূমিকা গ্রহণ ও পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা, মজুরি বৈষম্য দূরিকরণের দাবিসম্মেত তিনি কৃষি মজুরদের বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ আমাদের দায়িত্ব।

সার্বিকভাবে সকলের আলোচনার মধ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও প্রকৃতি, নিম্নবর্ণীয় শ্রেণির অবস্থান, কৃষি শ্রমিক মজুরদের বর্তমান অবস্থা, নারী আন্দোলনে নিম্নবর্ণীয়দের কণ্ঠকে সামনে নিয়ে আসা ও মূল্যায়ন করার মত বিষয়গুলো আমাদের সামনে উত্থাপিত হয়েছে। আমরা এই বিষয়গুলোকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এগুলো নিয়ে আমাদেরকে আরও ভাবতে হবে, আরও কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সকলেই বলেছেন যে, নিপীড়িত জনগোষ্ঠী বা জনগণ বা যাদেরকে নিম্নবর্ণীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। এজন্য সংগঠন করাকেও খুবই জরুরী কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা তাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। তাদের শ্রেণিচেতনাকে আরও জাগ্রত করতে হবে।

ভবিষ্যত কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা এই পাঁচদিন আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্রকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই বিষয়টা সবাই বলেছেন যে, রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রের চরিত্র আমাদের আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। রাষ্ট্র আমাদের জনগণের প্রতিনিধি বা রক্ষাকর্তা, সেই রাষ্ট্রের ভূমিকাটা কিরকম হওয়া উচিত, কী হলে আমরা জনগণ ভাল থাকবো, সেই বিষয়গুলো আলোচনা তুলে ধরেছেন। নারী ইস্যুকে আন্দোলনের সমান্তরাল ইস্যু হিসাবে নিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি জনগণকে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনেক বেশি। আমি মনে করি এটা নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হওয়া উচিত। কারণ শ্রেণি সম্পর্কে বৈষম্য দূর করা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ইস্যু। শ্রেণি সম্পর্কের মধ্যে যে বৈষম্য আছে, কিংবা যে দ্বন্দ্ব আছে, যে সংগ্রাম আছে, তাকে দূর করা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ইস্যু। সেখানে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর জনগণকে এক্ষেত্রে একটা চালকের ভূমিকা নিতে হবে। সবগুলো এজেন্সীকে বাধ্য করতে হবে, যেন তারা জনগণমুখী বা প্রো-জনগণ হয়ে নীতি নির্ধারণ করে এবং নীতি বাস্তবায়ন করে। এজন্য জ্ঞানের চর্চা এবং শিক্ষিত হওয়া জরুরী কাজ, যেটা আনু মুহাম্মদ বলেছেন যে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সেই এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে আরও অনেক জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। আজকের বাংলাদেশে আন্দোলনমুখী হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। নাহলে জনগণের নিজের অবস্থান বদল করা সুদূরপর্যন্ত হবে, অনেক দূরের ব্যাপার হয়ে

থাকবে এবং জনগণকে অন্য শ্রেণির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। নির্ভরশীলতা কখনোই কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বিভিন্ন এজেন্সীগুলোকে বাধ্য করতে কংক্রিট স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা, এখনকার অবস্থার বদলের জন্য। দীর্ঘদিন ধরে সবাই বলে আসছে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, রাষ্ট্রকে এই করতে হবে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীকে এই করতে হবে, নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে হবে। করতে হবে! কে করবে? কিভাবে করবে? কোন প্রক্রিয়ায় করবে? কী কী করলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে, এসব বিষয়ে কংক্রিট স্ট্র্যাটেজী গ্রহণ করা আমাদের সকলের জন্যই জরুরী। আমি মনে করি এই পাঁচদিনের ওয়েবিনারের আলোচনায় উত্থাপিত সমস্যা এবং কী করতে হবে এই বিষয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে সেগুলো নিয়ে ভবিষ্যতে আমাদের আরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাহলে হয়তো আমরা একটা বদল দেখতে পাব। আমরা নতুন দিনের একটা প্রত্যাশা করতে পারি। সবশেষে রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং এবং এর প্রতিনিধি বিনোদ কস্টিসহ সবাইকে ধন্যবাদ।

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক: তত্ত্ব ও বাস্তবতা” শীর্ষক ওয়েবিনার-এ অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ

নাম	পদবী
মনিরুল ইসলাম খান	অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম এম আকাশ	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আনু মুহাম্মদ	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
শামসুজ্জামান সেলিম	সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি
শামসুল বারি	চেয়ারম্যান, রিইব
হামিদা হোসেন	ভাইস চেয়ারপার্সন, রিইব
মেঘনা গুহঠাকুরতা	নির্বাহী পরিচালক, রিইব
বিনোদ কষ্টি	প্রজেক্ট ম্যানেজার, রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং
আবুল বারাকাত	প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার
মাহমুদুল করিম	যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক
ফরিদা আখতার	নির্বাহী পরিচালক, উবিনীগ
পাভেল পার্থ	পরিচালক, বারসিক
আজাদ খান	অধ্যাপক, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর
আবু নাসের অনিক	পরিকল্পনা ও ডকুমেন্টেশন সমন্বয়কারী, এইড ফাউন্ডেশন
ব্রাত্য আমীন	সমন্বয়কারী, রূপগাঁও
মিজানুর রহমান	পরিবেশ আন্দোলন কর্মী
সাফিয়া আজিজ	বিপণন সমন্বয়কারী, প্রাকৃতিক কৃষি বিপণন কেন্দ্র
রাবেয়া রওশন	গবেষক
মোঃ মাহাবুব হোসেন	উন্নয়ন সমন্বয়
মাসুদ	উন্নয়ন সমন্বয়
নৌশিন তাসনিম	উন্নয়ন সমন্বয়
হেলাল হেদায়েতুল ইসলাম	গবেষক
সুদীপ মণ্ডল	ছাত্র

নাম	পদবী
কবিতা রানী রয়	উন্নয়ন কর্মী
আল্লামা আল রাজী	উন্নয়ন কর্মী
রবার্ট শুভ্র	ছাত্র
নাইম খান	গবেষক
হোসনে আরা বেগম	উন্নয়ন কর্মী
মোঃ আবুল ফজল	বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, নীলফামারী
রুহি নাজ	সহকারী পরিচালক, রিইব
রাশিদা আক্তার	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব
বাবুল চন্দ্র সূত্রধর	প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব
মতিউর রহমান	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব, নীলফামারী
মোঃ ইফতেখার আলী	প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব
মোঃ রহুল আমীন	ফাইন্যান্স অফিসার, রিইব
উম্মে কুলসুম	ফাইন্যান্স অফিসার, রিইব
সৈয়দ নাভিদ আনজুম হাসান	ডকুমেন্টেশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার, রিইব
আনোয়ার হোসেন	গবেষণা সহকারী, বগুড়া, রিইব
চৈতন্য কুমার দাস	গবেষণা সহকারী, সাতক্ষীরা, রিইব
সুরাইয়া বেগম	পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব

Webinar On Class Relations

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক : তত্ত্ব ও বাস্তবতা

Schedule

20-24 August 2023 | 3-5 PM | Via Zoom

Professor Monirul Islam Khan
Department of Sociology
University of Dhaka



বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক:
কৃষক সমাজের প্রেক্ষিতে

20 August 2023
03:00 PM, Dhaka
Meeting ID: 812 7917 6161
Passcode: 1234

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক:
অর্থনৈতিক পরিসর ও বাস্তবতা

21 August 2023
03:00 PM, Dhaka
Meeting ID: 834 4757 8430
Passcode: 1234

Dr. Meghna Guhathakurta
Executive Director
Research Initiatives,
Bangladesh



নারীবাদ :
আন্দোলন ও শ্রেণি সম্পর্ক

22 August 2023
03:00 PM, Dhaka
Meeting ID: 846 2241 4356
Passcode: 1234

বাংলাদেশে শ্রেণি সম্পর্ক:
কৃষক ও শ্রমিকের প্রেক্ষিতে

23 August 2023
03:00 PM, Dhaka
Meeting ID: 845 8357 5832
Passcode: 1234

Shamsuzzaman Selim
Former President
Bangladesh Khetmajur Somiti



বাংলাদেশে ক্ষেতমজুর
আন্দোলন ও শ্রেণি সম্পর্ক

24 August 2023
03:00 PM, Dhaka
Meeting ID: 839 4542 8940
Passcode: 1234

RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH



Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
www.rib-bangladesh.org
www.youtube.com/ResearchInitiatives,BangladeshRIB

ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG
SOUTH ASIA

১২৮